POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ (سورة التوبہ:6)

এবং যদি মোশরেকদের মধ্য হইতে কেহ তোমার নিকট আশ্রয় চাহে তাহা হইলে তাহাকে আশ্রয় দাও যেন আল্লাহ্‌র বাণী শুনিতে পায়, অতঃপর তাহাকে তাহার নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দাও। ইহা এই জন্য যে, তাহারা এমন জাতি যাহারা কিছুই অবগত নহে।

(তওবা: ৬)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 9

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 10

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 7 March, 2024 25 শাবান 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

পশু বন্ধক রাখা

২৫১৮) হযরত আবু জার (গাফফারী) রাজিআল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'আমি নবী (সা.) কে জিজ্ঞাসা করি যে সর্বোত্তম কাজ কোনটি?' তিনি (সা.) উত্তর দিলেন, আল্লাহ্ তা'লার পথে জিহাদ করা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা। আমি বললাম, গোলামদের মধ্য থেকে কোন গোলাম মুক্ত করে দেওয়া উত্তম? তিনি (সা.) উত্তর দিলেন, যেটির মূল্য সর্বাধিক এবং মালিকের কাছে সব থেকে প্রিয়। আমি বললাম, আমি যদি এমনটি করতে না পারি? তিনি (সা.) বললেন, তবে কোন কর্মহীন সাহায্য করে তাকে কাজের ব্যবস্থা করে দাও অথবা কোন অদক্ষ ব্যক্তি, যে কিনা উপার্জন করতে পারে না, তাকে উপার্জন করতে সাহায্য কর। তিনি বললেন, আমি যদি এটিও না করতে পারি? আঁ হযরত (সা.) বললেন, তবে মানুষের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাক, কেননা এটি সদকা হবে যা তুমি নিজের জন্য করবে।

২৫২৮) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা আমার জন্য আমার উম্মতের সেই কুমন্ত্রণাকে উপেক্ষা করেছেন যা তাদের অন্তরে সৃষ্টি হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেগুলি বাস্তবায়িত হয় বা প্রকাশিত হয়।

২৫১২) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন- বন্ধক রাখা পশুর সওয়ারী করা উচিত, কেননা তাকে খাওয়ানোর জন্য খরচ করতে হয়। অনুরূপভাবে দুগ্ধদানকারী পশুও যদি বন্ধক থাকে তবে তার দুধ দোহন করা উচিত। কেননা তাকেও খাদ্য খাওয়াতে হয়। আর যে ব্যক্তি পশুর দুধ খায় এবং সওয়ারী করে, সে পশুর খাদ্যের খরচ বহন করবে।

(সহীহ বুখারী, ৪র্থ খণ্ড)

উপদেশ দানের মধ্যে নবুয়তের মহিমা ও মর্যাদা রয়েছে। তবে শর্ত হল কেউ যেন খোদা-ভীতিকে অবহেলা না করে।
অপরকে উপদেশ দাতার নিজের মধ্যেও এক বিশেষ প্রকারের সংশোধনের সুযোগ থাকে। কেননা, সে যা কিছু বলে, মানুষের সামনে অন্ততপক্ষে নিজের কার্যকলাপ দ্বারাও এই সব বিষয়গুলি করে দেখানো জরুরী।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

অযোগ্য ও দুশ্চরিত্র লোকেরা সত্য, ন্যায়পরায়ণতা ও প্রজ্ঞার কথার শোনার প্রতি আগ্রহী হয় না। তার সামনে যখনই তত্ত্বজ্ঞান ও প্রজ্ঞার কথা বলা হয় সে মনোযোগ দেয় না, অবজ্ঞাভরে এড়িয়ে যায়।

এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সত্যবাদীদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। কেবল আল্লাহ্ তা'লার কারণে সত্য কথা বলা মানুষের সংখ্যা খুবই কম, নেই বললেই চলে। সচরাচর যারা মানুষকে উপদেশ দান করে, কিন্তু তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য থাকে লোকেদের থেকে কিছু পাওয়া এবং উপার্জন করা। এই স্বার্থ যখন তার কথার সঙ্গে মিলে যায় তখন তা সত্য ও স্বর্গীয় আভাকে নিজের অন্ধকারে লুকিয়ে ফেলে আর খোদার বাণী শোনার ফলে মন ও প্রাণে যে আনন্দ ও তত্ত্বজ্ঞানের সৌরভ ঢেউ খেলে যায় এবং অন্তরাত্মাকে সুরভিত করে তোলে, তা স্বার্থ ও বস্তুবাদিতার দুর্গন্ধে চাপা পড়ে যায়। আর প্রায় লোকে ভরা মজলিসেই বলে ওঠে- 'মিঞা এই সব ফন্দি কেবলই তোমার পেট চালানোর ফিকির'।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অধিকাংশ মানুষ সৎ কর্মের উপদেশ দান এবং মন্দ কর্ম থেকে বিরত রাখার কাজটিকে আয়-উপার্জনের মাধ্যমে পরিণত করেছে। কিন্তু সকলেই এমনটা নয়।

এমন পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী মানুষও আছে যারা কেবল এই কারণে খোদা ও তাঁর রসুলের কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয় কেননা তারা সৎ কর্মের উপদেশ দান এবং মন্দ কর্ম থেকে বিরত রাখার জন্যই প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে আর এটাকে তারা নিজেদের কর্তব্য জ্ঞান করে। এই উপায়ে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি উপার্জনই তাদের অভিপ্রায় হয়ে থাকে। উপদেশ দানের মধ্যে নবুয়তের মহিমা ও মর্যাদা রয়েছে। তবে শর্ত হল কেউ যেন খোদা-ভীতিকে অবহেলা না করে।

অপরকে উপদেশ দাতার নিজের মধ্যেও এক বিশেষ প্রকারের সংশোধনের সুযোগ থাকে। কেননা, সে যা কিছু বলে, মানুষের সামনে অন্ততপক্ষে নিজের কার্যকলাপ দ্বারাও সেই সব বিষয়গুলি করে দেখানো জরুরী।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫০৫)

কুরআন করীমে 'সাআত' শব্দ কেবল পরকালের কিয়ামতের জন্য ব্যবহৃত হয় নি, বরং আম্বিয়াগণের জামাতের উন্নতি এবং তাদের শত্রুদের বিনাশের জন্যও 'সাআত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা হজ্জের ২-৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

এরই মাঝে রসুলুল্লাহ্ (সা.) মক্কায় আক্রমণের উদ্দেশ্যে দশ হাজার সংখ্যার সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেন এবং মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে মক্কার উপকণ্ঠে এসে পৌঁছন। অতঃপর তিনি আদেশ করলেন, শিবিরের সামনে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হোক। ধু-ধু প্রান্তরে গভীর রাত্রিতে হাজার হাজার মানুষের শিবিরের সামনে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি এক ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা করছিল। কিন্তু যেহেতু তিনি এই প্রস্তুতি অত্যন্ত গোপন রেখেছিলেন, সেই কারণে মক্কাবাসীরা ঘুণাক্ষরেও টের পায় নি যে, ইসলামী সেনা তাদের সামনে শিবির স্থাপন করে অপেক্ষা করছে।

আবু সুফিয়ান তার সঙ্গীদের নিয়ে যখন মক্কা থেকে বেরিয়ে এল,তখন সমগ্র মরুভূমিতে আগুন জ্বলতে দেখল। সে ভেবে আশ্চর্য হল যে এরা কারা? আবু সুফিয়ান তার সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করল, এখানে কি হচ্ছে? আকাশ থেকে কি কোন সৈন্যদল নেমে এসেছে। তারা বিভিন্ন গোত্রের নাম বলে, কিন্তু আবু সুফিয়ান প্রত্যেক গোত্রের নাম শুনত আর বলত- এই গোত্রের লোক সংখ্যা খুব কম, কিন্তু এদের সংখ্যা অনেক বেশি। তাদের এই কথোপকথনের মাঝেই অন্ধকারের বুক চিরে ভেসে এল 'আবু হানজালা' সম্বোধন। এটি ছিল আবু সুফিয়ানের ডাকনাম। আবু সুফিয়ান কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে বলল, আব্বাস, তুমি কোথায়? সে বলল, সামনে মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সেনাদল শিবির স্থাপন করেছে। যদি তুমি নিজে প্রাণে রক্ষা পেতে চাও তবে অবিলম্বে আমার বাহনে সওয়ার হও। নচেত উমর (রা.) আমার পিছনে আসছেন, তিনি তোমার সংবাদ নিবেন। হযরত আব্বাস যেহেতু আবু সুফিয়ানের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন,তাই তিনি আবু সুফিয়ানের হাত শক্ত করে ধরে টেনে নিজের বাহনের

এরপর ৭ পাতায়...

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

তাঁর দয়া যা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ তা'লার রঙে রঙিন ছিল তা এমন অবস্থায়ও উদ্বেলিত হয় যখন তিনি (সা.) গুরুতর আহত ছিলেন, (শরীর থেকে) রক্ত ঝরছিল। মানুষ যখন আল্লাহ্ তা'লার নবীর ওপর অত্যাচার করে এবং তাঁর প্রেমাস্পদের ওপর নিপীড়ন চালায় তখন আল্লাহ্ তা'লার ক্রোধ প্রকাশ পায়। কিন্তু তিনি (সা.) এই দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! এরা অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে এই অত্যাচার করছে, এদের তুমি ক্ষমা করে দাও। তাদের ভুলের কারণে তুমি তাদের ওপর শাস্তি অবতীর্ণ কোরো না। আল্লাহুম্মা সাল্লে আ'লা মুহাম্মাদীন ওয়া আ'লা আলে মুহাম্মাদীন। স্নেহ ও দয়ার কত মহান বহিঃপ্রকাশ।

যখন তাঁকে গর্ত থেকে তুলে আনা হয় আর তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে তখন তিনি (সা.) একথা চিন্তাতেই আনেন নি যে, শত্রুরা আমাকে আহত করেছে, আমার দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে, আমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু -বান্ধবকে শহীদ করে দিয়েছে; বরং তিনি (সা.) চেতনা ফিরে পেতেই এই দোয়া করেন, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِیْ فَاِنَّهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ (অর্থাৎ) "হে আমার প্রভু -প্রতিপালক! এই লোকেরা আমার পদমর্যাদাকে চিনতে পারে নি, তাই তুমি তাদের মার্জনা করো এবং তাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দাও।

লাল রঙের মাঝে কিছুটা দুঃখের বার্তাও ছিল। কেননা উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর আহত হওয়ার কারণে যতটা দুঃখ সাহাবীরা পেয়েছিলেন তেমন কষ্ট মহানবী (সা.)-এর পুরো জীবদ্দশায় সাহাবীদের কখনো হয় নি। এক দুঃখের পর তারা অপর কষ্টের সংবাদ পান আর এই শোকে তারা মুহ্যমান ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এই যুদ্ধে ফেরেশতাদের প্রতীক হিসেবেও এমন একটি রঙ বাছাই করা হয়েছে যার মাঝে দুঃখ, রক্ত এবং কষ্টের দিকটিও অন্তর্ভুক্ত ছিল।"

অকস্মাৎ মহানবী (সা.) হযরত সা'দ বিন মু'আয এবং হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)-র মাঝে দৃশ্যমান হন এবং আমরা তাঁর (সা.) হাঁটার ভঙ্গি দেখে তাঁকে চিনে ফেলি। সে সময় আমাদের আনন্দের কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না। তখন এমন মনে হচ্ছিল যেন আমরা পরাজিতও হই নি আর আমাদের কোনো ক্ষতিও হয় নি। যখন সব মুসলমান মহানবী (সা.)-কে দেখে চিনতে পারে তখন সবাই মহানবী (সা.)-এর চতুর্দিকে পতঙ্গের মতো জড়ো হয়ে যায়।

উহুদের যুদ্ধে আঁ হযরত (সা.) এর আহত হওয়ার ঘটনা এবং সাহাবাগণের আত্মনিবেদনের ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ২৬ জানুয়ারী , ২০২৪, **এর জুমুআর খুতবা (২৬ সুলাহ, ১৪০৩ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِیْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - مٰلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ - اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ - صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ۙ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّآلِّیْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, (উহুদের) যুদ্ধে মহানবী (সা.) যে আঘাত পেয়েছিলেন এ সংক্রান্ত কতক বিস্তারিত রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-র রেওয়ায়েত অনুযায়ী, ঐ সময় মহানবী (সা.) বলেছেন, اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰی مَنْ قَتَلَهُ النَّبِیُّ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰی قَوْمٍ دَمَّوْا وَجْهَ نَبِیِّ اللّٰهِ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা সেই ব্যক্তির প্রতি চরম ক্রোধান্বিত হন যাকে আল্লাহ্‌র নবী (সা.) আল্লাহ্‌র পথে হত্যা করেন এবং আল্লাহ্‌র ক্রোধ ঐ জাতির জন্য কঠোররূপে মূর্ত হয় যারা আল্লাহ্‌র নবী (সা.)-এর পবিত্র মুখমণ্ডলকে রক্তে রঞ্জিত করেছে।

তিবরানীর রেওয়ায়েত হলো, মহানবী (সা.) যখন (গুরুতর) আহত হন তখন তিনি বলেন, اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰی قَوْمٍ كَلَّمُوْا وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (উচ্চারণ: ইশতাদ্দা গাযাবুল্লাহি আ'লা কওমীন কালামূওয়াজহা রসূলিল্লাহ্)। অর্থাৎ, সেই জাতির ওপর আল্লাহ্‌র কোপানল অতি কঠিন রূপ ধারণ করে যারা মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখমণ্ডলকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। এরপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলেন, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِیْ فَاِنَّهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও, কেননা তারা অবুঝ।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের বিবরণও এটিই যে, মহানবী (সা.) বার বার বলছিলেন, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِیْ فَاِنَّهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও, কেননা তারা অবুঝ।

কাজেই, তাঁর দয়া যা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ তা'লার রঙে রঙিন ছিল তা এমন অবস্থায়ও উদ্বেলিত হয় যখন তিনি (সা.) গুরুতর আহত ছিলেন, (শরীর থেকে) রক্ত ঝরছিল। মানুষ যখন আল্লাহ্ তা'লার নবীর ওপর অত্যাচার করে এবং তাঁর প্রেমাস্পদের ওপর নিপীড়ন চালায় তখন আল্লাহ্ তা'লার ক্রোধ প্রকাশ পায়। কিন্তু তিনি (সা.) এই দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! এরা অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে এই অত্যাচার করছে, এদের তুমি ক্ষমা করে দাও। তাদের ভুলের কারণে তুমি তাদের ওপর শাস্তি অবতীর্ণ কোরো না। আল্লাহুম্মা সাল্লে আ'লা মুহাম্মাদীন ওয়া আ'লা আলে মুহাম্মাদীন। স্নেহ ও দয়ার কত মহান বহিঃপ্রকাশ।

সহীহ্ বুখারীতে এই রেওয়ায়েতটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ: كَاَنِّیْ اَنْظُرُ اِلَی النَّبِیِّ یَحْكِیْ نَبِیًّا مِنَ الْاَنْبِیَاءِ ضَرَبَهٗ قَوْمُهٗ فَاَدْمَوْهُ وَهُوَ یَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهٖ وَیَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِیْ فَاِنَّهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ -

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি যেন এখনও মহানবী (সা.)-কে দেখছি, তিনি নবীদের মধ্য হতে একজন নবীর অবস্থা বর্ণনা করছেন যাকে তাঁর জাতির লোকেরা মারতে মারতে রক্তে রঞ্জিত করে দিয়েছিল আর তিনি নিজের মুখমণ্ডল থেকে রক্ত পরিষ্কার করতে করতে বলছিলেন, "হে আল্লাহ্! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও, কেননা তারা জানে না (তারা কী করছে)।" (বুখারী, কিতাব আহাদীসুল আম্বিয়া, হাদীস-৩৪৭৭)

এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)ও সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে বিস্তারিত লিখেছেন যে, মহানবী (সা.) গিরিপথে পৌঁছে

হযরত আলী (রা.)-র সাহায্যে নিজের ক্ষতস্থান ধৌত করেন এবং তাঁর গালে যে দুটি আংটা ঢুকে গিয়েছিল তা হযরত আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহ্ (রা.) অনেক কষ্টে নিজের দাঁত দিয়ে টেনে বের করেন। এ প্রচেষ্টায় তার দুটি দাঁতও ভেঙে গিয়েছিল। এ সময় তাঁর ক্ষতস্থান থেকে অনেক বেশি রক্তক্ষরণ হচ্ছিল আর এই রক্ত দেখে তিনি (সা.) পরিতাপের সাথে বলছিলেন, كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَبُوْا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ بِالدَّمِ وَهُوَ يَدْعُوْهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ (উচ্চারণ: কাইফা ইয়ুফলিহু ক্বওমুন খাযাবূ ওয়াজহা নাবীয়্যিহিম বিদ্‌দামে ওয়া হুয়া ইয়াদউহুম ইলা রাব্বিহিম)। সেই জাতি কীভাবে মুক্তি পাবে যারা নিজেদের নবীর মুখমণ্ডলকে শুধু এই অপরাধে তাঁ ারইরক্তে রঞ্জিত করে দিয়েছে যে, তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করেন? এরপর তিনি (সা.) কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলেন, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ, হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও, কেননা অজ্ঞতার কারণে এবং না জেনে তাদের দ্বারা এই অপরাধ হয়ে গেছে। রেওয়ায়েতে এসেছে, এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কুরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ অর্থাৎ, শাস্তি এবং ক্ষমার বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লার হাতে, এতে তোমার কোনো ভূমিকা নেই। খোদা তা'লা যাকে চাইবেন ক্ষমা করে দিবেন আর যাকে চাইবেন শাস্তি দিবেন। এরপর লিখেছেন, ফাতেমাতুয্ যাহরা (রা.) যিনি মহানবী (সা.) সম্পর্কে ভয়ংকর সংবাদ শুনে মদীনা থেকে ছুটে এসেছিলেন, তিনিও কিছুক্ষণের মধ্যে উহুদের প্রান্তরে পৌঁছে যান আর পৌঁছামাত্রই তাঁর (সা.)ক্ষতস্থান ধৌত করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু রক্তপ্রবাহ কোনোভাবেই বন্ধ হচ্ছিল না। অবশেষে হযরত ফাতেমা (রা.) চাটাইয়ের একটি টুকরা পুড়িয়ে এর ছাই তাঁর ক্ষতস্থানে বেঁধে দেন, তখন গিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ হয়। অন্যান্য নারীরাও এসময় আহত সাহাবীদের সেবা-শুশ্রূষা করে পুণ্য অর্জন করেছিলেন।" (সীরাত খাতামান্নাবীঈন,পৃ: ৪৯৭-৪৯৮)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এই ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেন যে, উহুদের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.)-এর শিরস্ত্রাণে একটি পাথর লাগে আর এর আংটা মহানবী (সা.)-এর মাথায় বিদ্ধ হয়। মহানবী (সা.) অচেতন হয়ে সেই সাহাবীদের (মৃতদেহের) ওপর পড়ে যান যারা তাঁর আশেপাশে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। এরপর আরও কয়েকজন সাহাবীর মৃতদেহ মহানবী (সা.)-এর পবিত্র দেহের ওপর পড়ে। লোকেরা ধরে নেয়, তিনি (সা.) মৃত্যু বরণ করেছেন। কিন্তু যখন তাঁকে গর্ত থেকে তুলে আনা হয় আর তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে তখন তিনি (সা.) একথা চিন্তাতেই আনেন নি যে, শত্রুরা আমাকে আহত করেছে, আমার দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে, আমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু -বান্ধবকে শহীদ করে দিয়েছে; বরং তিনি (সা.) চেতনা ফিরে পেতেই এই দোয়া করেন, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (অর্থাৎ) "হে আমার প্রভু -প্রতিপালক! এই লোকেরা আমার পদমর্যাদাকে চিনতে পারে নি, তাই তুমি তাদের মার্জনা করো এবং তাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দাও।" (তফসীরে কবীর, ৭ম খন্ড, পৃ: ৬৭-৬৮)

উহুদের যুদ্ধে ফেরেশতাদের আগমন এবং তাদের যুদ্ধ করার ব্যাপারেও উল্লেখ পাওয়া যায়।

সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদের দিন আমি মহানবী (সা.)-এর ডানে এবং বামে দুই ব্যক্তিকে দেখেছি; তারা সাদা পোশাক পরিহিত ছিলেন এবং তুমুল যুদ্ধ করছিলেন। আমি এই দুজনকে পূর্বে কখনো দেখি নি আর পরবর্তীতেও কখনো দেখি নি; অর্থাৎ জিব্রাঈল (আ.) ও মিকাঈল (আ.); আর এটি বায়হাকী বর্ণনা করেছেন।

এছাড়া মুজাহিদও বর্ণনা করেছেন। (তারা) বলেন, ফেরেশতারা কেবল বদরের দিন লড়াই করেছিলেন। বায়হাকী বলেন, তার বক্তব্যের মর্ম হলো, মুসলমানরা যখন মহানবী (সা.)-এর অবাধ্যতা করে এবং তাঁর নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত থাকে নি তখন আর ফেরেশতারা যুদ্ধ করেন নি। {এটি গিরিপথে নিযুক্তদের প্রতি ইঙ্গিত, অর্থাৎ যখন তারা আনুগত্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন আর অবিচল থাকেন তখন ফেরেশতারা (তাদের) সুরক্ষা করছিলেন। আর যখন তারা অধৈর্য প্রদর্শন করে তখন ফেরেশতারাও তাদের নিরাপত্তার ছায়া তুলে নেয়। আল্লাহ্‌ই সবচেয়ে ভালো জানেন।}

এ সম্পর্কে মুহাম্মদ বিন উমর তার শিক্ষকদের বরাতে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ, بَلٰى إِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا (আয়াত) সম্পর্কে রেওয়ায়েত করেন যে, তারা অবিচল থাকে নি বরং পলায়ন করেছিল; তাই তাদের সাহায্য করা হয় নি। আর তার বরাতে এই রেওয়ায়েতও করা হয়েছে যে, তার শিক্ষকরা বলেছেন, মুসআব বিন উমায়ের (রা.) শহীদ হয়ে গেলে তার আকৃতি ধারণ করে একজন ফেরেশতা পতাকা আঁকড়ে ধরেছিলেন এবং সেইদিন ফেরেশতারা উপস্থিত হয়েছিলেন, কিন্তু তারা যুদ্ধ করেন নি।

হারেস বিন সিম্মা (রা.) এই অবস্থার চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে বলেন, উহুদের দিন মহানবী (সা.) গিরিপথে ছিলেন। তিনি (সা.) আমাকে আব্দুর রহমান বিন অউফ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তখন আমি নিবেদন করি, আমি তাকে পাহাড়ের কাছে দেখেছিলাম। তখন তিনি (সা.) বলেন, নিঃসন্দেহে ফেরেশতারা তার সাথে যুদ্ধ করছে। হারেস বলেন, এরপর আমি আব্দুর রহমানের কাছে ফিরে যাই। তখন আমি তার সামনে সাতজন কাফিরকে মৃত অবস্থায় দেখি। তখন আমি বললাম, আপনার ডান হাত সফল হয়েছে! এদের সবাইকে আপনি হত্যা করেছেন? তিনি বলেন, এই দুজনকেআমি হত্যা করেছি। আর এদেরকে এমন ব্যক্তি হত্যা করেছে যাকে আমি দেখি নি। তখন আমি বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) আমাদেরকে সত্য বলেছেন, অর্থাৎ ফেরেশতারা তার সাথে যুক্ত হয়ে যুদ্ধ করছিল।

ইবনে সা'দ আব্দুল্লাহ্ বিন ফযল বিন আব্বাসের বরাতে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, উহুদের দিন আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) মুসআব বিন উমায়েরকে পতাকা দান করেন। এরপর মুসআব শহীদ হয়ে যান। তখন এই পতাকাটি মুসআব-এর চেহারাধারী একজন ফেরেশতা ধরে ফেলেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, হে মুসআব, সামনে অগ্রসর হও। তখন সেই ফেরেশতা তাঁকে (সা.) সম্বোধন করে বলেন, আমি মুসআব নই। তখন আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বুঝতে পারেন, তিনি একজন ফেরেশতা যার মাধ্যমে তাঁকে সাহায্য করা হয়েছে।

মুহাম্মদ বিন সাবেত (রা.) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) উহুদের দিন বলেন, হে মুসআব! তুমি সামনে অগ্রসর হও। তখন আব্দুর রহমান বিন অউফ নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! মুসআবকে তো শহীদ করা হয়েছে। তিনি (সা.) বলেন, অবশ্যই, কিন্তু একজন ফেরেশতা তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এবং তার নাম তাকে দেওয়া হয়েছে।

আল্লামা ইবনে আসাকির, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস হতে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, উহুদের দিন আমি নিজেকে দেখেছি যে, আমি তির নিক্ষেপ করছি আর সেই তিরগুলোকে আমার কাছে শুভ্র বস্ত্র পরিহিত সুদর্শন ব্যক্তি ফেরত নিয়ে আসছিল। আমি তাকে চিনতে পারি নি, যে কারণে আমার ধারণা হয়, সে ফেরেশতা ছিল।

উমায়ের বিন ইসহাক হতে বর্ণিত হয়েছে যে, উহুদের দিন লোকেরা আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর কাছ থেকে দূর ছিটকে পড়ে। আর সা'দ তাঁর (সা.) সামনে তিরন্দাজি করতে থাকেন এবং একজন যুবক তাকে তির উঠিয়ে দিচ্ছিল। তিনি যখনই তির নিক্ষেপ করতেন, সে তা উঠিয়ে নিয়ে আসত। তিনি (সা.) বলেন, হে আবু ইসহাক, তোমার তির চালাও। যখন তিনি যুদ্ধ শেষ করেন তখন সেই যুবককে কোথাও দেখতে পান নি আর কেউ তাকে চিনতও না।

আল্লামা বায়হাকী, উরওয়া থেকে আল্লাহ্ তা'লার বাণী وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ (আলে ইমরান: ১৫৩) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ধৈর্য এবং তাকওয়ার শর্তে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ক্রমাগতভাবে আগমনকারী ৫ হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে তাদেরকে সাহায্য করবেন, আর আল্লাহ্ তা'লা এমনটিই করেছেন। কিন্তু যখন তারা আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অমান্য করেছে আর সারি ত্যাগ করেছে এবং তিরন্দাজরা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ- 'নিজ অবস্থান থেকে সরবে না'- এটি অমান্য করল এবং জাগতিক বস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষা করল তখন ফেরেশতা সাহায্য প্রত্যাহার করল। আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন যে, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ إِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِإِذْنِهٖ (সূরা আলে ইমরান: ১৫৩)। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের সাথে কৃত স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেখিয়েছেন, যখন তোমরা তাঁর আদেশে তাদের মূলোৎপাটন করছিলে। আল্লাহ্ তা'লা নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেখিয়েছেন আর তাদেরকে বিজয় দান করেছেন, কিন্তু যখন তারা আদেশ অমান্য করে তখন তাদেরকে পরীক্ষায় নিপতিত করেন।

(সুবুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২০৫-২০৬)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)ও নিজের এক খুতবায় এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন যে, সাহাবীগণ (রা.) বর্ণনা করেন, বদরের যুদ্ধে যে ফেরেশতাদের দেখা গেছে তাদের মাথায় কালো রঙের পাগড়ি ছিল এবং তাদের একটি উর্দি ছিল। সাহাবীরা যখন সেই ফেরেশতাদের দেখেন তখন তারা সেভাবেই মাথায় কালো পাগড়ি পরিহিত ছিল। যখন বিভিন্ন রেওয়ায়েত সংকলন করা হয় তখন তারা আশ্চর্য হয়ে যান। কিন্তু যেমনটি মহানবী (সা.) مُسَوِّمِيْنَ শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন তেমনটিই নির্ধারিত ছিল আর হুবহু তা-ই হয়েছে। অনুরূপভাবে উহুদের যুদ্ধে যে ফেরেশতাদের দেখা গেছে তাদের মাথায় প্রতীক স্বরূপ লাল পাগড়ি ছিল। (আর দুররুল মানসুর)

লাল রঙের মাঝে কিছুটা দুঃখের বার্তাও ছিল। কেননা উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর আহত হওয়ার কারণে যতটা দুঃখ সাহাবীরা পেয়েছিলেন তেমন কষ্ট মহানবী (সা.)-এর পুরো জীবদ্দশায় সাহাবীদের কখনো হয় নি। এক দুঃখের পর তারা অপর কষ্টের সংবাদ পান আর এই শোকে তারা মুহ্যমান ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এই যুদ্ধে ফেরেশতাদের প্রতীক হিসেবেও এমন একটি রঙ বাছাই করা হয়েছে যার মাঝে দুঃখ, রক্ত এবং কষ্টের দিকটিও অন্তর্ভুক্ত ছিল।" (খুতবাতে তাহের, ২য় খণ্ড, পৃ: ৭৬) অর্থাৎ লাল রঙ।

সাহাবীদের অবিচলতা ও আত্মবিলীনতারও অনেক ঘটনা রয়েছে যে, তারা কীভাবে মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তা বিধানে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

হযরত আনাস বিন নযর আনসারী (রা.) সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়; হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমার চাচা হযরত আনাস বিন নযর (রা.) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। তখন তিনি (রা.) নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রথম যে যুদ্ধ করেছেন তাতে আমি অনুপস্থিত ছিলাম। যদি আল্লাহ্ তা'লা আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার তৌফিক দেন তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই দেখবেন– আমি কী করি। অতএব যখন উহুদের দিন আসে আর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মুসলমানরা পিছু হটে তখন তিনি (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্! তারা যা করেছে আমি তার জন্য তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। (তিনি মুসলমানদের কথা বলছিলেন যারা বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল।) এরপর বলেন, আমি তোমার কাছে দায়মুক্তি প্রকাশ করছি তা থেকে যা তারা করেছে বা যা মুশরিকরা করেছে। এরপর তিনি সামনে অগ্রসর হন এবং হযরত সা'দ বিন মুআযের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি বলেন, হে সা'দ বিন মুআয! জান্নাত। এরপর বলেন, নযরের খোদার কসম! আমি উহুদের দিক থেকে এর (অর্থাৎ জান্নাতের) সুঘ্রাণ পাচ্ছি।

হযরত সা'দ (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এরপর তিনি যা করেছেন আমি তা করতে পারি নি। (অর্থাৎ, তিনি এই ঘটনা মহানবী (সা.)–এর কাছে বিবৃত করছিলেন।) তিনি বলেন, তিনি যেমন বীরত্বে র সাথে লড়াই করেছেন আমি তা করতে পারি নি। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমরা তার দেহে আশিটির কিছু অধিক তরবারির অথবা বর্শা ও তিরের আঘাত দেখেছি। আর আমরা যখন তাকে পাই তখন তিনি শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। আর মুশরিকরা তার লাশ বিকৃত করেছিল। তার আপন বোন ছাড়া তাকে কেউ চিনতে পারে নি। তিনি আঙ্গুলের ডগা দেখে হযরত আনাস (বিন নযর)–কে সনাক্ত করেছেন।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা জানতাম অথবা তিনি বলেছেন, আমরা মনে করতাম, এই আয়াত তার এবং তার মতো অন্যদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যে, مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ (সূরা আল্ আহযাব: ২৪) অর্থাৎ, এই মু'মিনদের মাঝে এমন কিছু মানুষ রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত তাদের অঙ্গীকার সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছে।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস–২৮০৫)

ইবনে ইসহাক বলেন, আনাস বিন মালেকের চাচা আনাস বিন নযর, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ এবং উমর বিন খাত্তাব (রা.) প্রমুখ মুহাজির ও কতিপয় আনসারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন; তারা সবাই বসে ছিলেন। আনাস (রা.) তাদের বলেন, তোমরা বসে আছ কেন? তারা বলেন, মহানবী (সা.) তো শহীদ হয়ে গিয়েছেন। আনাস (রা.) তখন বলেন, তাহলে মহানবী (সা.)–এর মৃত্যুর পর তোমরা জীবিত থেকে কী করবে? যেভাবে তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন সেভাবে তোমরাও মৃত্যুকে বরণ করে নাও! এরপর আনাস (রা.) কাফিরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন আর এমনভাবে লড়াই করেন যে, অবশেষে শহীদ হয়ে যান। তার নামেই আনাস বিন মালেকের নাম রাখা হয়েছে।

আনাস বিন মালিক বর্ণনা করেন, সেদিন আমরা আনাস বিন নযরকে এ অবস্থায় পাই যে, তার শরীরে সত্তরটি আঘাতের চিহ্ন ছিল এবং তার বোন ছাড়া কেউ তার লাশ চিনতে পারে নি। তিনি তার আঙুলের ডগা দেখে তাকে চিনেছেন। (সীরাতুন্নবী লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৫৩৫)

এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে বর্ণনা করেন, সেসময় ভয়াবহ যুদ্ধ চলছিল এবং মুসলমানদের জন্য একটি কঠিন বিপদ ও পরীক্ষার মুহূর্ত ছিল আর মহানবী (সা.)–এর শাহাদতের সংবাদ শুনে অনেক সাহাবী মনোবল হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং অস্ত্র ফেলে দিয়ে মাঠের একদিকে বসে পড়েছিলেন। তাদের মাঝে হযরত উমর (রা.)–ও ছিলেন। অতএব এসব লোকেরা এভাবে রণক্ষেত্রের একদিকে বসে ছিলেন আর তখন এক সাহাবী আনাস বিন নযর আনসারী আসেন এবং তাদেরকে দেখে বলেন, তোমরা এখানে কী করছ? তারা উত্তর দিল, রসূলুল্লাহ্ (সা.) শাহাদত বরণ করেছেন; এখন আর যুদ্ধ করে কী লাভ?

আনাস বলেন, এখনই তো যুদ্ধ করার সময় যেন মহানবী (সা.) যে মৃত্যু লাভ করেছেন তা আমাদের কপালেও জোটে। এছাড়া তাঁকে ছাড়া জীবনের কী–ই বা আনন্দ!

অতঃপর তাদের সামনে সা'দ বিন মুআয আসেন। তখন তিনি বলেন, সা'দ! আমি তো পাহাড় থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি। এটি বলে আনাস শত্রুসারিতে ঢুকে পড়েন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান। যুদ্ধের পর তার শরীরে আশিটির বেশি আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায় এবং কেউই চিনতে পারছিল না যে, এটি কার লাশ? অবশেষে তার বোন আঙুল দেখে তাকে চিহ্নিত করেন।" (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৪৯৪–৪৯৫)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)ও এ বিষয়ে বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধ যখন হয়েছিল তখন হযরত আনাস (রা.)–র চাচাও তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি পরম বীরত্ব প্রদর্শন করেন। প্রচণ্ড লড়াই করেন এবং মহানবী (সা.)–কে কাফিরদের আক্রমণ থেকে সর্বাত্মকভাবে রক্ষার চেষ্টা করেন। পরিশেষে বিজয় লাভ হয়। বিজয় লাভের পর মুসলমানরা শত্রুদের বন্দি করা ও তাদের মালামাল একত্রিত করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নির্বোধ শত্রুরা এটিকে লুটপাট বলে অভিহিত করে।"

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, যুদ্ধশেষে যখন তারা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ একত্রিত করছিলেন তখন শত্রুরা সেটির নাম লুটপাট রেখেছিল। অথচ এটি লুটপাট হয় না বরং শত্রুদের দুর্বল করার একটি মাধ্যম হয়ে থাকে। যাহোক, তিনি মনে করেন যে, এখন আমার দায়িত্ব পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ক্ষুধা লেগেছিল এবং কিছু খেজুর তার কাছে ছিল। তাই তিনি যুদ্ধের ময়দান থেকে কিছুটা পিছনে সরে গিয়ে বিজয়–উল্লাসে মেতে ওঠেন এবং খেজুর খেতে থাকেন। খেজুর খেতে খেতে পায়চারি করতে করতে একদিকে এসে দেখেন, হযরত উমর (রা.) একটি পাথরের ওপরে বসে কাঁদছেন। তিনি তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে যান এই ভেবে যে, আজ তো হাসি–আনন্দের দিন, অভিনন্দনের দিন। এমন অবস্থায় ইনি কাঁদছেন কেন? অতএব তিনি হযরত উমর (রা.) কে সম্বোধন করে বলেন, আরে ভাই! আজ তো আনন্দের দিন, কেননা আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের বিজয় দান করেছেন আর তুমি এখন কাঁদছ! হযরত উমর (রা.) বলেন, তুমি সম্ভবত জানো না যে, বিজয়ের পর কী হয়েছে? তিনি বললেন, কী হয়েছে? হযরত উমর (রা.) বলেন, শত্রুবাহিনী পিছন থেকে আসে এবং পুনরায় আক্রমণ করে, যার ফলে ইসলামী বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং মহানবী (সা.) শহীদ হন। সেই আনসারী বলেন, উমর! তবুও তো এটি কান্নার সময় নয়। একটি খেজুর তার হাতে রয়ে গিয়েছিল। তিনি সেটিকে তৎক্ষণাৎ ফেলে দেন এবং খেজুরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমার এবং আমার খোদার মাঝে একটি খেজুর ছাড়া আর কী প্রতিবন্ধকতা আছে? অতঃপর তিনি হযরত উমর (রা.)–র দিকে তাকান এবং বলেন, উমর! মহানবী (সা.) যদি শহীদ হয়ে গিয়ে থাকেন তাহলে এ পৃথিবীতে আমাদের (বেঁচে থেকে) কী লাভ? সুতরাং তিনি যেখানে গিয়েছেন আমরাও সেখানেই যাব! একথা বলেই তিনি তরবারি ধারণ করেন আর একাই হাজার হাজার শত্রুর ওপর হামলে পড়েন। হাজার হাজার সংখ্যার বিপরীতে একজন লোকের ক্ষমতাইবা কী? চতুর্দি ক থেকে তার ওপর আক্রমণ হয় ফলে তিনি শহীদ হয়ে যান। যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) যখন তার মরদেহ খোঁজ করতে বলেন তখন তার দেহের সত্তরটি খণ্ড পাওয়া যায়; বরং কতক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, তার লাশ শনাক্তই করা যাচ্ছিল না। অবশেষে তার এক বোন বা অন্য কোনো আত্মীয় তার আঙ্গুলের একটি চিহ্ন দ্বারা তাকে শনাক্ত করেন।" (খুতবাতে মাহমুদ, ২৩ তম খণ্ড, পৃ: ৪৪২–৪৪৩)

এ ঘটনাটি অপর একস্থানে তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন, উহুদের যুদ্ধে যখন মহানবী (সা.)–এর শাহাদতের গুজব রটে তখন তিনি অর্থাৎ হযরত আনাস (রা.)–র চাচা হযরত উমর (রা.)–কে একটি টিলাতে বসে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞেস করেন, উমর! মু সলমানরা যেখানে (যুদ্ধে) জয় লাভ করেছে সেখানে (তোমার) কাঁদার কারণ কী? হযরত উমর জবাবে বলেন, তুমি কি জানো না, মহানবী (সা.) শহীদ হয়ে গিয়েছেন?

হযরত আনাস (রা.)–র চাচা যখন এ সংবাদ শুনেন তখন তিনি খেজুর খাচ্ছিলেন আর তাঁর হাতে একটি খেজুরই অবশিষ্ট ছিল। সেই খেজুরটি ছুড়ে ফেলে দেন আর বলেন, আমার ও আল্লাহ্ তা'লার মধ্যখানে এটি ছাড়া আর কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। রসূলপ্রেমে তিনি হযরত উমর (রা.)–র দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকান এবং বলেন, উমর! মহানবী (সা.) যেখানে পরপারে চলে গিয়েছেন তাহলে তুমি এখানে বসে বসে কাঁদছ কেন? তিনি (সা.) যেখানে চলে গিয়েছেন আমিও সেখানেই যাচ্ছি! আর অমনি একাই তিন হাজার শত্রুর ওপর হামলে পড়েন। কাফিররাও সম্ভবত তাঁকে বদ্ধ উন্মাদ মনে করে থাকবে। তিনি লড়তে লড়তে শাহাদত বরণ করেন। আর যুদ্ধ শেষে যখন লাশ সন্ধান করা হয় তখন তাঁর দেহের সত্তরটি খণ্ড পাওয়া যায়। দেহের প্রতিটি অংশ পৃথক হয়ে গিয়েছিল।" (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড–২৩, পৃ: ৩৭৩)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিত তাঁর শাহাদতের কথা বর্ণনা করেছেন। কোথাও বিস্তারিত, কোথাও আবার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে। একস্থানে তিনি বর্ণ না করেন: একটি হাদীসে রয়েছে, একজন আনসারী সাহাবী হযরত মালিক বিন আনাস (রা.) ভুলক্রমে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি যখন বদরী সাহাবীদের মুখে বদরের যুদ্ধের কৃতিত্ব শোনেন তখন উত্তেজনায় পায়চারি করতে থাকেন আর বলেন, এ কী কথা! সুযোগ পেলে আমিও দেখাব যে, মু'মিন কেমন কুরবানী করে! অতঃপর তিনি উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। পিছন দিক থেকে আকস্মিক আক্রমণের ফলে মুসলমানরা যখন কোণঠাসা হয়ে পড়ে তখন কিছুক্ষণের জন্য তারা রণাঙ্গন ছেড়ে বাইরে চলে যায় আর মহানবী (সা.) একা হয়ে যান এবং কাফিরদের প্রস্তরাঘাতের আহত হয়ে অন্য আহত ব্যক্তিদের মাঝে পড়ে যান, ইতঃমধ্যে আরো কিছু লোক আহত হয়ে তাঁর (সা.) ওপর পড়ে যায়, তখন কয়েক মিনিট পর মানুষজন তাঁকে (সা.) দেখতে না পেয়ে মনে করে যে, মহানবী (সা.) শহীদ হয়ে গিয়েছেন। তখন কতক ব্যক্তি ছুটে গিয়ে উহুদ প্রান্ত রের অদূরে মদীনাতে গিয়ে এ সংবাদ ছড়িয়ে দেয় যে, মহানবী (সা.) শহীদ হয়ে গিয়েছেন। সংবাদটি রণাঙ্গানের অদূরে থাকা লোকজনের জন্য বজ্রপাতের ন্যায় ছিল। তাঁদের মাঝে হযরত উমর (রা.)–ও ছিলেন। তিনি একটি পাথরের ওপর বসে কাঁদছিলেন, তখনই মালিক বিন আনাস (রা.) যিনি যুদ্ধের পূর্বে খাবার খান নি, দু –তিনটি খেজুর খেতে খেতে তার পাশ দিয়ে

যাচ্ছিলেন। তিনি যেহেতু সেসময় রণাঙ্গন থেকে বেরিয়েছেন যখন কিনা মুসলমানরা জয় লাভ করেছিল আর কাফিররা পরাজিত হয়েছিল, পক্ষান্তরে হযরত উমর তখন রণাঙ্গন থেকে এসেছিলেন যখন শত্রুপক্ষ পিছন থেকে দ্বিতীয়বার আক্রমণ রচনা করেছিল আর মহানবী (সা.) আহত হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন এবং কিছু সাহাবী ভেবেছিলেন, তিনি (সা.) শহীদ হয়ে গেছেন– এজন্য তিনি অর্থাৎ হযরত উমর (রা.) তখন কাঁদছিলেন। অপরদিকে মালিক আনন্দিত ছিলেন একারণে যে মুসলমানরা বিজয় লাভ করেছে। সুতরাং তার কান্নাকাটি দেখে মালিক অবাক হন এবং তিনি বিস্ময়ের সাথে হযরত উমরকে দেখতে থাকেন ও বলেন, হে উমর! এটি কি খুশির সময় নাকি কান্নার? আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের বিজয় দান করেছেন, আমাদের তো আনন্দ করা উচিত। হযরত উমর (রা.) মাথা উঠিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলেন, মালিক, তুমি হয়ত জানো না যে, পরবর্তীতে যুদ্ধের চিত্র পাল্টে গেছে। শত্রুরা পাহাড়ের পিছন থেকে এসে পুনরায় আক্রমণ করেছে এবং আকস্মিক আক্রমণের ধাক্কা সামলাতে না পেরে ইসলামী সেনারা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে এবং মহানবী (সা.) শহীদ হয়ে গেছেন।

তখন মালিকের হাতে শেষ খেজুরটি ছিল। তিনি খেজুরটি উঠিয়ে মাটিতে নিক্ষেপ করলেন আর বলেন, আমি ও আমার প্রেমাস্পদের মধ্যে এ খেজুর ছাড়া আর কোনো বাধা আছে কি?

অতঃপর হযরত উমরকে সম্বোধন করে বলেন, তুমি যা বলছ তা যদি সত্যি হয়ে থাকে তবু ও এটি কান্নার কোনো সময় নয়। আমাদেরও সেখানে যাবার প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন যেখানে আমাদের প্রেমাস্পদ গিয়েছেন। এই বলে খাপ থেকে তরবারি বের করলেন এবং বিশাল শত্রুবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। একা একজন মানুষ শত–সহস্র মানুষের মোকাবিলা কীভাবে করবে? কিছুক্ষণের মধ্যেই তার দেহ খণ্ডবিখণ্ড হয়ে মাটিতে ছড়িয়ে–ছিটিয়ে পড়ে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা যখন মুসলমানদের বিজয়ী করলেন তখন মহানবী (সা.) বললেন, মালিক বিন আনাসকে সন্ধান করো, সে কোথায়? সবাই এসে সংবাদ দিল, তার কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি (সা.) পুনরায় তাকে খুঁজে আনার নির্দেশ দিলেন। ইতঃমধ্যে তার বোন মদীনা থেকে মহানবী (সা.)–এর শহীদ হবার উদ্বেগজনক সংবাদ পেয়ে ছুটতে ছুটতে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছান এবং অবশেষে একস্থানে তিনি একটি লাশের কিছু টুকরো পড়ে থাকতে দেখেন, যে টুকরোগুলোর একটি আঙুল দেখে তিনি চিনতে পারেন, এটি তার ভাই মালিকের লাশ এবং মহানবী (সা.)–কে সেই সংবাদ দেন।"

(তফসীরে কবীর, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৫৮৫–৫৮৬)

[নোট: তফসীরে কবীরের এই উদ্ধৃতিতে মালিক বিন আনাস (রা.)–এর নাম বর্ণিত হয়েছে। অথচ হাদীস এবং ইতিহাস গ্রন্থে তাঁর নাম হযরত আনাস বিন নাজার (রা.) বলে উল্লেখ আছে। তাই এখানে প্রকৃত নামই লেখা হচ্ছে]

এই ছিল মহানবী (সা.)–এর সাহাবীদের রসূলপ্রেম। ধারাবাহিক যে বর্ণনা চলছে তা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

আপনাদের দোয়ায় ইয়েমেনের আহমদীদেরও স্মরণ রাখবেন। তারা বর্তমানে ভীষণ সমস্যা কবলিত। অনুরূপভাবে মুসলিম উম্মাহ্র জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের মধ্যেও একতা ও ঐক্য সৃষ্টি করুন এবং তাদেরকে বিবেকবুদ্ধি দিন। বিশ্বের সার্বিক অবস্থার জন্যও দোয়া করুন। পরিস্থি তি দ্রুত যুদ্ধের দিকে গড়াচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন।

আমি নামাযের পর দু জন প্রয়াত ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা পড়াব। প্রথম জানাযা হচ্ছে সিয়েরালিওনের নায়েব আমীর মোকাররম হাফেয ডাক্তার আব্দুল হামীদ গুমাঙ্গা সাহেবের। তিনি গত ১৩ই জানুয়ারি সংক্ষিপ্ত অসুস্থতার পর পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। ***'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন।'*** মরহুম আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসী ছিলেন।

সিয়েরা লিওন জামা'তের আমীর মূসা মেওয়া সাহেব তার ব্যাপারে লিখেছেন, ডাক্তার গুমাঙ্গা সাহেব সিয়েরা লিওনে সর্বাধিক পরিমাণ ওসীয়্যতের চাঁদা আদায়কারী ছিলেন। তিনি বলেন, আমি যখন সবার কাছে নতুন জলসাগাহ্ ক্রয়ের এবং সে উদ্দেশ্যে আর্থিক সাহায্যের আবেদন করি তখন ডাক্তার সাহেব সবচেয়ে বেশি চাঁদা দেওয়ার ওয়াদা করেন এবং তার মৃত্যুর পূর্বে দশ হাজার আমেরিকান ডলার অনু দান পরিশোধও করেন। ডাক্তার সাহেব নুসরত জাহাঁ স্কীমের অধীনে পাঁচ বছর ওয়াক্ফ করেছিলেন। নাইজেরিয়াতে তার পোস্টিং হয়েছিল, কিন্তু বিষয়টি এখনো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কাগজপত্র সম্পূর্ণ হয় নি। ইতঃমধ্যে আমাদের একজন পাকিস্তানি ডাক্তার যাবার কারণে তিনি ফ্রি–টাউনের হাসপাতালেই সেবা করার সুযোগ পাচ্ছিলেন এবং সেখানে তিনি খুব নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ সময়ে হাসপাতাল থেকে তার আয়ের প্রাপ্ত অংশ হাসপাতালকে দিয়ে দেন এবং হাসপাতালের সৌন্দর্যবর্ধন ও সংস্কারের কাজ করিয়েছেন। স্থানীয় মুদ্রায় এই অর্থে র পরিমাণ ছিল দুই লক্ষ লিওন। খিলাফতের প্রতি সুগভীর ভালোবাসা ছিল। তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো আক্ষেপ যার জন্য তিনি আফসোস করতেন তা হলো, যুগ–খলীফার সাথে তার সাক্ষাৎ হয় নি। আমার সাথে তিনি সাক্ষাতের দুবার চেষ্টা করেছেন; অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু তিনি ভিসা পান নি। ডাক্তার হিসেবে তিনি অভাবী রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করতেন। এমন অনেক ছাত্র যাদের পিতা–মাতা তাদের কলেজের ফিস দিতে পারতেন না তাদেরকে ডাক্তার সাহেব সাহায্য করতেন। খুব সৎ, পরিশ্রমী এবং পরোপকারী ছিলেন। লন্ডনের টমী কালোন সাহেবের ছোটো বোন দিয়া ইয়াদা কামাঙ্গা সাহেবার সাথে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের দুটি ছোটো ছোটো সন্তান রয়েছে যাদের একজনের বয়স তিন বা চার বছর এবং অপরজনের দুই বছর; অর্থাৎ এক পুত্র ও এক কন্যা রয়েছে।

সেখানকার মুরব্বী সাঈদুল হাসান শাহ্ বলেন, তিনি অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন যা আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি। নতু ন আমীর মূসা মেওয়া সাহেবের টিমের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন ডাক্তার গুমাঙ্গা সাহেব। কেনিয়া থেকে গাইনোকোলজিতে বিশেষজ্ঞ ডিগ্রি অর্জন করে তিনি সিয়েরা লিওনে আসেন। তার এক বিশেষ গুণ ছিল যে, তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। অহর্নিশি পরিশ্রম করতেন এবং তার স্ত্রী–সন্তানরা হয়ত তার জন্য অপেক্ষা করছে– একথা তিনি ভুলে যেতেন। তিনি পবিত্র কুরআনের হাফেযও ছিলেন এবং খুব সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, গত রমযানে কেন্দ্রীয় জামা'তে তিনি তারাবীহ্র নামাযও পড়ান এবং মানুষ খুব উপভোগ করে। বিনয়ডাক্তার সাহেবের এক উল্লেখযোগ্য গুণ ছিল। সদা হাস্যবদনে সাক্ষাৎ করতেন এবং নিজের অসুস্থতা ও কষ্ট লুকিয়ে রাখতেন।

মুরব্বী সিলসিলাহ্ সাফীর আহমদ সাহেব বলেন, ডাক্তার সাহেব অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন। এলাকায় স্বনামধন্য ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর হাতে আরোগ্য রেখেছিলেন। মানুষ যখন তাঁর কাছে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে আসত তখন তিনি তাদের দৈহিক চিকিৎসার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক চিকিৎসাও করতেন এবং তাদেরকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের শিক্ষা সম্বন্ধে অবা হত করতেন। মরহুম নামায–রোযায় অভ্যস্ত এবং তাহাজ্জুদ আদায়কারী ছিলেন। সময়মতো চাঁদা ইত্যাদি প্রদান করতেন। জামা'তের কাজের জন্য নিজের জাগতিক কাজ পরিত্যাগ করে জামা'তের ডাকে তাৎক্ষণিক সাড়া দিতেন। জামা'তের কর্মকর্তা এবং মুরব্বীদের অশেষ সম্মান করতেন। জুমুআর নামাযের জন্য বিশেষ প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন এবং সকল ব্যস্ততা পরিত্যাগ করে পোর্টলোকো মসজিদে জুমুআর নামাযপড়ার জন্য আসতেন।

দ্বিতীয় নায়েব আমীর আব্দুল হাই করোমা সাহেব বলেন, ডাক্তার গুমাঙ্গা সাহেব সিয়েরা লিওনের স্থানীয় ভাষা মেন্ডেতে কুরআন অনুবাদ কমিটির সদস্যও ছিলেন। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায়কারী ও তাহাজ্জুদ আদায়কারী ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, প্রকৃত অর্থে তিনি একজন ওয়াকেফে যিন্দেগী ছিলেন। সরকারি দায়িত্ব পালন শেষে আহমদীয়া হাসপাতালে যেতেন এবং মাগরিব পর্যন্ত সেখানে কাজ করতেন আর এরপর মিশন হাউজ যেতেন। গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করতেন, এরপর বাড়ি যেতেন। প্রায়শ তিনি সত্য স্বপ্ন দেখতেন এবং এর সত্যতাও প্রকাশ পেত। তিনি বলেন, যুগ–খলীফার দিকনির্দেশনা অনুযায়ী জামা'তের জন্য দশ বছর মেয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন যেন ভবিষ্যতে জামা'তের জন্য কর্মী বাহিনী সামনে আসে। বর্ণনাকারী বলেন, নায়েবে আমীর হিসেবে তার সাথে এ অধমের গভীর সম্পর্ক ছিল। জামা'তের প্রতি আন্তরিকতা আর আল্লাহ্র অধিকার এবং বান্দার অধিকার প্রদান করা, দানশীলতা, বিনয় আর আর্থিক কুরবানী করা– এক কথায়অনেক উত্তম বৈশিষ্ট্য তাঁর মাঝে ছিল।

আলওয়ামী সিসা সাহেব বলেন, তিনি ১৯৮৯ সালে সিয়েরা লিওনের জামেয়াতুল মুবাশ্বিরীনে ভর্তি হন এবং ১৯৯১ সালে পড়াশোনা সম্পন্ন করেন। পড়াশোনায় বেশ ভালো নাম্বার পেয়েছিলেন। সব সময় ভালো নাম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হতেন। সর্বপ্রথম যেখানে তার পদায়ন হয় সেখানেই পবিত্রকুরআন হিফয করা আরম্ভ করে দেন। নিজ উদ্যোগে তিনি কুরআন হিফয করেন। এরপর গৃহযুদ্ধ বেঁধে যায়। সিয়েরা লিওনে কর্মরত সকল পাকিস্তানি মুবাল্লিগকে সেখান থেকে ফেরত চলে আসতে হয়। ডাক্তার সাহেব এরপর ফ্রি–টাউনে চলে আসেন। সেখানে মিশনারির দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। সেসময় সেখানকার ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। এখান থেকে অর্থাৎ কেন্দ্র থেকে সিয়েরা লিওন জামা'তের জন্য কিছু জিনিসপত্র পাঠানো হয়। বিদ্রোহীরা এই বিষয়টি টের পেলে মিশন হাউসে হামলা করে। যাহোক, তারা (অর্থাৎ আহমদীরা) ঘরের সিলিংয়ের ভেতর লুকিয়ে পড়েন। কিন্তু একজন, অর্থাৎ এই ঘটনা বর্ণনাকারী আহমদীকে সেই বিদ্রোহীরা ধরে ফেলে। তার মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে বলে, স্টোরের চাবি না দিলে তোমাকে হত্যা করব। স্টোরের চাবি ডাক্তার গুমাঙ্গা সাহেবের কাছে ছিল। যখন ডাক্তার সাহেব দেখলেন যে, পরিস্থিতি বেগতিক ও ভয়ংকর, তিনি তৎক্ষণাৎ নীচে নেমে আসেন আর চাবি তাদেরকে দিয়ে দেন। কিন্তু যাহোক, তারা সেখান থেকে সামান্য কিছু নিয়ে চলে যায়।

খালেদ মাহমুদ সাহেব লিখেন, ডাক্তার সাহেব খিলাফতের সাথে অত্যন্ত ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সম্পর্ক রাখতেন এবং একজন নিতান্তই নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। প্রত্যেককে অনেক সম্মান করতেন। জামা'তের প্রতি আন্তরিক ছিলেন। ছোটো–বড়ো সবাইকে সম্মান দিয়ে কথা বলতেন। জামা'তের উন্নতির জন্য যে কেউ কোনো রকম পরামর্শ দিলে তা তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করতেন। তিনি বলতেন, জামা'তে এমন নিষ্ঠাবান থাকা উচিত যারা সদাসর্বদা জামা'তের উন্নতির বিষয়ে

সচেষ্ট থাকবে। আরও বলেন, অনেক কম মানুষই এমন দেখেছি যে ভুলকে ভুল আর সঠিককে সঠিক বলার সাহস রাখে। ডাক্তার সাহেব একজন নির্ভীক ও সাহসী মানুষ ছিলেন। কথা বলার ধরন বেশ সুন্দর ছিল। সবার সাথে নম্রভাবে কথা বলতেন। সব কাজ ছেড়ে নামায আদায় করতেন। কেউ কড়া কথা বললেও তিনি নম্রভাবে সেটির উত্তর দিতেন আর সাথে এটাও বলতেন, একজন আহমদীর এরূপ কঠোর ভাষা ব্যবহার করা উচিত নয়।

লাজনা ইমাইল্লাহ্, যুক্তরাজ্য, সিয়েরা লিওনে নিজেদের একটি মাতৃসদন হাসপাতাল নির্মাণ করছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বেশ বড়ো প্রজেক্ট এটি। লাজনার প্রাক্তন সদর ডাক্তার ফারিয়া সেখানে পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি দেখেছি, তিনি নিতান্তই পরোপকারী একজন মানুষ ছিলেন। যখন লাজনার (নির্মানাধীন) মাতৃসদন হাসপাতাল পরিদর্শনে যাই তখন ডাক্তার সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ হয়। লাজনার হাসপাতাল নির্মাণ প্রসঙ্গে অনেক মূল্যবান পরামর্শ তিনি প্রদান করেছিলেন। এরপর তিনি নিজেদের সরকারি হাসপাতালটি আমাকে ঘুরিয়ে দেখান। তার ভেতরে মানবসেবার স্পৃহা আমাকে যারপরনায় প্রভাবিত করেছে। বিরূপ পরিস্থিতি সত্ত্বেও একাধারে অগণিত রোগী তার নিকট আসত, কিন্তু তার চেহারায় মৃদু হাসি ও সহমর্মিতা ছাড়া আর কিছুরই দেখা মিলত না। তার মাঝে এক অদ্ভুত নিমগ্নতা ছিল যে, 'আমাকে আমার এই দরিদ্র দেশের দরিদ্র নাগরিকদের সাহায্য করতে হবে।' যাহোক, তার ধারণা ছিল, যখন মাতৃসদন নির্মাণ সম্পন্ন হয়ে যাবে তখন সেখানে তার সেবা করার সুযোগ হবে। তবে আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা ভিন্ন ছিল।

তার স্ত্রী কাদিয়াতা বলেন, আমার স্বামী একজন পুণ্যবান মানুষ ছিলেন, জামা'তের একজন নিষ্ঠাবান ও নিবেদিতপ্রাণ আহমদী ছিলেন। সর্বদা জামা'তকে নিজের ব্যক্তিগত বিষয়াদির ওপর প্রাধান্য দান করতেন। তিনি চিকিৎসার জন্য সেনেগাল গিয়েছিলেন। সেনেগাল যাওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে বলেন, আমাদের আল্লাহ্ তা'লার ওপর ঈমান ও পূর্ণ আস্থা রয়েছে আর এটাই আমাদের সবকিছু । তাই এখন যা-ই হোক না কেন, বিচলিত হবে না। তার স্ত্রী আরও বলেন, মরহুম তার রোগীদের, বিশেষ করে আহমদী রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করতেন এবং তাদের যত্ন নিতেন। এছাড়াও অন্যান্য অনেক গুণাবলির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আমার স্বামীর মৃত্যুর পর আমি মানুষজনের কাছ থেকে তার অনেক গুণাবলির কথা জানতে পারি। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি পাঁচ বেলা নামায আদায়কারী ছিলেন, নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তেন আর কোনো ব্যত্যয় ছাড়া নিজের যৎসামান্য যে আয় হতো- তা থেকে হিসাব করে চাঁদা প্রদান করতেন।প্রত্যেক বছর রমযান মাসে পবিত্র কুরআন কমপক্ষে একবার পুরোটা পাঠ করতেন এবং আমাকেও এর জন্য তাগাদা দিতেন। খুব ভালো স্বামী ও পিতা ছিলেন। আমাদেরকে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যেরাখতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি দয়া ও ক্ষমাসু লভ আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার স্ত্রী, সন্তানদেরও হাফেয ও নাসের হোন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হবে তাহেরা নযীর বেগম সাহেবার, যিনি তাহেরা রশীদ উদ্দীন নামে পরিচিত ছিলেন; মুরব্বী সিলসিলাহ্ চৌধুরী রশীদ উদ্দীন সাহেবের স্ত্রী। সম্প্রতি তিনি মৃত্যুবরণ করেন, ***'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন।'*** । আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে মূসীয়া ছিলেন। তার বংশে আহমদীয়াতের সূচনা তার দাদা হযরত চৌধুরী গোলাম হুসায়ন সাহেবের মাধ্যমে হয়েছিল। একইভাবে তার নানা হযরত চৌধুরী গোলাম হায়দার ধারিওয়াল সাহেবও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। পূর্বেই বলেছি তার বিবাহ চৌধুরী রশীদ উদ্দীন সাহেবের সাথে হয়েছে। ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বরে তার বিবাহ মওলানা জালাল উদ্দীন শামস সাহেব হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র উপস্থি তিতে পড়িয়েছিলেন, আর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) দোয়া করিয়েছিলেন।

তিনি নিজের একটি স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ১৯৮০ সালে আমি মজলিসে শূরায় যাবার টিকেট পাই; প্রতিনিধি হিসেবে যাই। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)ও শূরায় উপস্থিত ছিলেন। মজলিসে শূরায় সাহাবীদের সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্ক চলছিল যে, বয়সের দৃষ্টিকোণ থেকে কারা সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত আর কারা নয়। তিনি বলেন, আমি ঘরে এসে খুব আফসোসের সাথে বলছিলাম, হে আল্লাহ্! যদি আমি সে সময় থাকতাম তাহলে আমিও সাহাবীয়াদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হতাম। এরই মাঝে আমি স্বপ্ন দেখি এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দর্শন লাভ হয়। হুযূর আমার ঘরে ডানদিক ফিরে শুয়েছিলেন। আমি মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাই। হুযূর (আ.) অত্যন্ত স্নেহের সাথে আমার দিকে দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, কী উদ্দেশ্যে আসা হয়েছে? আমি নিবেদন করলাম, হুযূর, আমি আপনার হাত-পা টিপে দিতে চাই। হুযূর নিজের ডানহাত দিলেন এবং আমি অনেক সময় ধরে টিপতে থাকলাম। এরপর হুযূর মাগরিবের নামাযের জন্য উঠানে গেলেন। আমিও বাহিরে উঠানে গিয়ে দেখতে পেলাম, অনেক ভিড়। লোকেরা জানালা ও চিলেকোঠার ওপর চড়েছে হুযূরকে দেখার জন্য। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কীভাবে জানলেন, হুযূর আমার বাড়িতে আছেন? তারা বলল, তোমার বাড়িতে আসলেন আর আমরা জানব না- এটা কীভাবে হতে পারে? ৩৭নং গলির বাসিন্দা তার কোনো বয়স্কা আত্মীয়া ছিলেন যিনি রুটি বানাচ্ছিলেন; (তিনি বলেন,)তাকে আমি ডাক দিয়ে বললাম, রুটি বানানো বাদ দিন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমার বাড়িতে এসেছেন; তাকে এসে দেখুন। এরপর আমি বলি, শূ রাতে বলা হয়েছিল, হুযূ রকে কেউ দেখে থাকলেসে সাহাবীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আমার বাড়িতে হুযূর (আ.) দু দিন এবং একরাত অবস্থান করেছেন, আমি তো সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি! (তিনি বলেন,) আমি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি যারপরনায় কৃতজ্ঞ, যা প্রকাশের ভাষা আমার নেই!

তার পুত্র ডক্টর আলীমুদ্দিন আয়ারল্যান্ডে জামা'তের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টও ছিলেন। বর্তমানে এখানেই বসবাস করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মাতাকে অসংখ্য গুণাবলিতে ভূষিত করেছিলেন। তার মাঝে বিশেষত আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক , আল্লাহ্ তা'লার সাথে ব্যক্তিগত ভালোবাসা ও প্রেমের সম্পর্ক ছিল। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত দোয়া কবুল হওয়ার গুণ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় ছিল। তিনি সত্যস্বপ্ন ও কাশ্ফের অভিজ্ঞতা রাখতেন। আহমদীয়া খিলাফতের প্রতি ব্যক্তিগত ভালোবাসা ও প্রেম ছিল যা সারা জীবন তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল আর যা তিনি নিজের সন্তানদের মাঝে বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। শৈশবে আমাদের বাড়িয়ে যেসব বুযূ র্গ ব্যক্তিত্বেরকথা উল্লেখ করা হতো, অর্থাৎ মা যাদের ঘটনা বর্ণনা করতেন, জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের কোনো বড়ো মর্যাদা ছিল না, বরং বুযুর্গ নারীদের নাম বা খলীফাদের কথা বলতেন যা শৈশব থেকেই আমাদের কানে প্র তিধ্বনিত হতে থাকে। সেসব বুযুর্গের কাছে আমাদের মা নিয়মিত দোয়ার আবেদন জানাতেন। (এমনটি নয় যে, নিজে দোয়া করতেন বলে অন্যের কাছে দোয়া চাইতেন না। তিনি নিজেও অন্যের কাছে দোয়ার জন্য বলতেন।)

তিনি বলেন, এগুলো ছাড়াও আমাদের মায়ের ব্যক্তিত্বেযেসব গুণ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হতো তা হলো, জামা'তের জন্য গভীর আত্মাভিমান। একবার আমাদের বাড়িতে দূরসম্পর্কের এক আত্মীয় জামা'ত সম্পর্কে অসঙ্গত বাক্য ব্যবহার করে। সাধারণত লোকেরা এ ধরনের কথা শুনে নীরব হয়ে যায়, কিন্তু আমাদের মা তৎক্ষণাৎ কড়া ভাষায় উত্তর দেন। প্রথমে তাকে নিবৃত্ত করেন, তারপর তার ভুল সংশোধন করেন। বংশের সদস্যদের মাঝে এটি সর্বজনবিদিত বিষয় ছিল যে, তিনি যে-কোনো আত্মীয়ের সাথে বাগ্বিতণ্ডায় লিপ্ত হবেন, কিন্তু জামা'তের সম্মানে সামান্য আঁচড় লাগতে দিবেন না।

তার স্বামী চৌধুরী রশীদ উদ্দীন সাহেব জামা'তের মুরব্বী ছিলেন। তবলীগের উদ্দেশ্যে দুবার আফ্রিকায় গিয়েছিলেন। তিনি পাকিস্তানেই অবস্থান করেন এবং সন্তানদের উত্তম তরবীয়তের জন্য পূর্ণ চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। তিনি বলেন, আমার স্মরণ আছে, তার পুত্রদের অর্থাৎ আমাদের ভাইদেরবন্ধুদের সম্পর্কেও তার জানা ছিল যে, তারা কারা এবং কী প্রকৃতির ছেলে। সবসময় তিনি বলতেন, এলাকার পুণ্যবান এবং পড়ালেখায় ভালো এমন ছেলেদের সাথে বন্ধুত্ব হওয়া উচিত, যার-তার সাথে নয়। তারপর বলেন, একটি বিষয় যা আমি পর্যবেক্ষণ করেছি, বেশিরভাগ সময় তার এমন নারীদের সাথে বন্ধুত্ব হতো যাদের আল্লাহ্ তা'লার সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। তিনি নিজেই বলতেন, জগতপূজারীদের বৈঠকে আমি স্বাদ পাই না, বরং সহজ-সরল এবং ধর্মপ্রাণ লোকদের সাহচর্যে আমি আনন্দ পাই।

যাবদা, তৈয়্যবা এবং আবেদা- তার তিন মেয়েই বলেন, যখন থেকে আমরা বুঝতে শিখেছি, আমাদের মা'কে একান্ত ইবাদত পালনকারী, দোয়াকারী, মিশুক এবং পুণ্যস্বভাবের অধিকারিণী পেয়েছি। পরম বিনয় ও আহাজারির সাথে ইবাদত করতেন। নফল ও তাহাজ্জুদ পরম আন্তরিকতার সাথে পড়তেন। যখনই কোনো সমস্যা দেখা দিত তখনই তিনি নিজের কক্ষের দরজা বন্ধ করে দীর্ঘসময় সেজদাবনত থাকতেন। ওয়াকেফে যিন্দেগী হিসেবে যখনই অভাব-অনটনের সম্মুখীন হতে হয়েছে, তিনি পরম ধৈর্য, দৃঢ় মনোবল এবং সাহসিকতার সাথে আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসা করে সেগুলো সহ্য করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছেই যাচনা করেছেন। তার হজ্জে যাওয়ারও সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তার এই বাসনাও পূর্ণ করেছেন। তিনি এগারোবার ইতিকাফ করেছেন। মেয়েরা বলেন, সমবেদনা জানাতে যে-সকল মহিলারা এসেছেন তারা বিশেষভাবে তার স্নেহ-ভালোবাসা, উত্তম বৈশিষ্ট্য এবং মিশুক স্বভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। ধর্মীয় বইপুস্তক পাঠ করতেন। বিশেষ করে জীবনচরিত বিষয়ক বই খুবই আগ্রহ নিয়ে পাঠ করতেন। জুমুআর দিন ইবাদতের জন্য বিশেষ প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। কয়েক ঘণ্টা পূর্বে মসজিদে গিয়ে নফল আদায় করতেন।

মরহুমার এক পুত্র সলীম উদ্দীন সাহেব মুরব্বী সিলসিলাহ্; তিনি বর্তমানে নাযের উমুরে আম্মা হিসেবে রাবওয়ায় কর্ম রত আছেন। তিনি বলেন,

আমাদের মা ওয়াকেফে যিন্দেগীর সহধর্মিণী ছিলেন। যেমনটি আমি বলেছি, তার বিবাহ জালাল উদ্দীন শামস সাহেব পড়িয়েছেন এবং হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) দোয়া করিয়েছেন। এই বিবাহের ঘটনাও তার পিতা তাকে বলেছেন। তার পিতার অর্থাৎ তাহেরা সাহেবার স্বামীর বিবাহ অন্য কোথাও হচ্ছিল। বিবাহের সকল প্রস্তু তি সম্পন্ন হয়। রাবওয়ার নুসরত মসজিদে মওলানা আবুল আতা জলন্ধরি সাহেবের এই বিবাহের ঘোষণা করার কথা ছিল। সবাই এসেছিলেন। হযরত মওলানা আবুল আতা জলন্ধরি সাহেব অন্য সবার বিয়ে পড়ান কিন্তু তার বিয়ে পড়ান নি। তিনি বলেন, তুমি ওয়াকেফে যিন্দেগী, তোমার বিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) পড়াবেন অথবা তাঁর (রা.) উপস্থি তিতে হবে। যাহোক, কিছুদিন পর যেখানে বিয়ে ঠিক হয়েছিল এবং হওয়ার কথা ছিল সেখান থেকে অর্থাৎ কনেপক্ষ থেকে অস্বীকৃতি জানানো হয়। আর এরপর তার বিয়ে তাহেরা সাহেবার সাথে ঠিক হয় এবং এ বিয়ে খুবই বরকতপূর্ণ হয়েছে।

চাঁদার প্রদানের ক্ষেত্রেও তিনি নিয়মিত ছিলেন। কানাডার সেক্রেটারি মাল সাহেব একবারতাকে লিখেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি, রেজিস্টার খুে লে চাঁদার হিসাব করছি। এরই মাঝে তাহেরা রশীদ উদ্দীন সাহেবা সেখানে পাশে এসে বসে পড়েন। আমি বলি, আপনি এখন তাহরীকে জাদীদে পাঁচ হাজার ডলার দিয়ে দিলে আপনার নাম পাঁচ হাজারের রেজিস্টারে লেখা হবে। স্বপ্নে তিনি রাজি হয়ে যান। সে সময় তিনি পাকিস্তানে গিয়েছিলেন। পাকিস্তান থেকে ফেরত আসার পর স্বপ্নের কথা তাকেজানাই। আমার আশা ছিল, তিনি এমনটিই করবেন। যখন এই স্ব প্নের কথা তাকে বলা হলো তখন তাৎক্ষণিকভাবে পাঁচ হাজার ডলার তিনি এই খাতে প্রদান করেন। (আল্লাহ্ তা'লা ততদিনে তাকে স্বাচ্ছন্দের অধিকারী করে দিয়েছিলেন।)

আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন, এবং তার সন্তানদেরও তার সৎগুণাবলীগুলো অব্যাহত রাখার তৌফিক দিন।

****

১ম পাতার শেষাংশ.....

পিছনে বসালেন এবং সোজা বাহন হাঁকিয়ে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হলেন। সেখানে যেতেই তিনি রসুল করীম (সা.)- এর চরণতলে আবু সুফিয়ানকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, হে রসুলুল্লাহ্ (সা.)! আবু সুফিয়ান বয়আত করার জন্য হাজির হয়েছে।

..... হযরত আব্বাস (রা.)-এর জোর করার কারণে আর যেহেতু তার দুই সাথীও বয়আত করে নিয়েছিলেন, কিছুটা সেই কারণেও সেও ইসলাম গ্রহণ করে নিল। এরপর সে বলল, হে রসুলুল্লাহ্! মক্কার লোকেরা যদি অস্ত্র ধারণ না করে তবে কি তারা নিরাপদ থাকবে? আঁ হযরত (সা.) বললেন, হ্যাঁ, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি নিজের গৃহের দরজা বন্ধ করে নিবে এবং যুদ্ধ করবে না, তাকে নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, হে রসুলুল্লাহ্! আবু সুফিয়ান তার সম্মানের বিষয়ে অনেক বেশি যত্নবান, তার সম্মানেরও কোনও উপায় বের করা হোক।আঁ হযরত (সা.) বললেন, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশকরবে, তাকেও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। সে বলল, হে রসুলুল্লাহ! মক্কার জনসংখ্যা দৃষ্টিতে রাখলে আবু সুফিয়ানের গৃহ অনেক ছোট। তিনি (সা.) বললেন, যে ব্যক্তি হাকিম বিন হাজাম এর গৃহে প্রবেশ করবে, তাকেও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি অস্ত্র সমর্পণ করবে তাকেও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। আর যে কেউ খানা কাবায় গিয়ে আশ্রয় নিবে তাকেও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। সে বলল, হে রসুলুল্লাহ! এই স্থানগুলিও মক্কার জনসংখ্যার বিচারে যথেষ্ট নয়। তিনি (সা.) বললেন, বেশ, আমার কাছে কিছু কাপড় নিয়ে এস। কাপড় নিয়ে আসা হলে তিনি সেগুলো দিয়ে একটি পতাকা তৈরী করলেন এবং সেটি বেলালের ভাই রাওহা নামে এক সাহাবীর হাতে দিয়ে বললেন, এটি বেলালের পতাকা। যে কেউ এই পতাকা তলে আশ্রয় নিবে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

এই ঐতিহাসিক ঘটনা বলে দেয় যে, আবু সুফিয়ান যখন মক্কা গিয়ে ঘোষণা করছিল, তখন মানুষ কিরূপ উন্মাদের ন্যায় নিজেদের গৃহ, খানা কাবা, বিলালের পতাকা এবং আবু সুফিয়ান ও হাকিম বিন হাজাম এর গৃহের দিকে ছুটছিল আর প্রকম্পিত হৃদয়ে, টলমল পায়ে তারা দিগ্বিদিকশূন্য হয়ে ছোটাছুটি করছিল। সেই সময় আঁ হযরত (সা.) যে হযরত বিলালের পতাকা তৈরী করার মাধ্যমে মক্কাবাসীদের লাঞ্ছিত করার এবং বিলালকে প্রীত করার এক সূক্ষ্ম কৌশলকে কাজে লাগিয়েছিলেন। মক্কাবাসী হযরত বিলালকে ইসলাম গ্রহণের কারণে বছরের পর বছর যাতনা দিত। রসুল করীম (সা.) চিন্তা করলেন, বিলাল হয়তো মনে করতে পারে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) স্বজাতিকে তো ক্ষমা করে দিলেন, কিন্তু আমার বুকের আঘাত ও বেদনার কোন প্রতিশোধ নিলেন না। তিনি (সা.) বিলালের নামে পতাকা তৈরী করে তাঁর এক ভাইয়ের হাতে দিয়ে বললেন, যে কেউ বিলালের পতাকাতলে এসে দাঁড়াবে তাকেও ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯৩) আর এই রূপে তিনি একাধারে নিজের কোমলতার প্রমাণও দিয়েছেন আবার বিলালের মর্মপীড়াকেও প্রশমিত করেছেন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ:৬)

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান- এ খিদমতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি

'নাযারত তালিম' এর অধীনস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে তথা তালিমুল ইসলাম উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে ফিজিক্যাল এজুকেশন এবং কম্পিউটার শিক্ষক নিয়োগ।

নিয়োগের জন্য শর্তাবলীঃ

কম্পিউটার শিক্ষক:

1) Qualification: BCA/B.Sc(IT/CS/internet Science), B.Tech (IT/CS).

প্রত্যাশীকে ইংরেজির পাশাপাশি হিন্দী ও পাঞ্জাবীতে টাইপিং জানতে হবে। (২) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক কোর্সে ৫৫% নম্বর থাকতে হবে এবং কোন অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। স্নাতকোত্তর প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

Physical Education Teacher

1) B.A with Physical Educatin as an Elective subject. 2) 3 Year Graduation Course in Physical Education and B.P.Ed. 2) 4 years integrated Course of Bachelor of Physical Education from recognised University.

৩) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক কোর্সে ৫৫% নম্বর থাকতে হবে এবং কোন অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। স্নাতকোত্তর প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। (৪)প্রত্যাশীর বয়স ২০ উর্দ্ধ এবং অনুর্দ্ধ ৪০ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ব্যতিক্রম হিসেবে বয়সে ছাড় দেওয়া যেতে পারে।৬) লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। (৭) লিখিত পরীক্ষা, কম্পিউটার টেস্ট এবং ইন্টারভিউয়ে উত্তীর্ণ হলে প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস ও স্বাস্থ্য পরীক্ষায় নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে। (৮) প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। (৯) প্রত্যাশী প্রার্থী নির্বাচিত হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। পরে থাকার বিষয়ে কোন প্রকারের আবেদন গ্রাহ্য করা হবে না। ১০) বেতন ও ভাতা সম্পর্কে অন্যান্য তথ্য জানতে নিচে দেওয়া ই-মেল ও ফোন নম্বরে অফিসের সময় জেনে নিন।

(নোট: লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ -এর দিনক্ষণ জানানো হবে।)

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান -এ ড্রাইভার হিসেবে কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি

২য় শ্রেণীর কর্মী নিয়োগের জন্য শর্তাবলী:

(১)প্রত্যাশীর বয়স ১৮ বছরে উর্দ্ধে এবং অনুর্দ্ধ ৪০ হতে হবে। (২) প্রত্যাশীকে অন্ততপক্ষে ৮ম শ্রেণী উত্তীর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয় (৩) প্রত্যাশীর কাছে বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। ৪) জন্ম-তারিখের জন্য স্বীকৃত শংসাপত্রের ফটোকপি দেওয়া আবশ্যক। (৫) ঘোষণার ২ মাসের মধ্যে যে সমস্ত আবেদন পত্র জমা পড়বে সেগুলি বিবেচিত হবে। (৬) কেন্দ্রীয় কর্মী নিয়োগ কমিটি দ্বারা আয়োজিত ইন্টারভিউয়ে উত্তীর্ণ হলে তবেই প্রত্যাশীকে নির্বাচন করা হবে। (৭) ইন্টারভিউ এ উত্তীর্ণ প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে। (৮) প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। (৯)প্রত্যাশী নির্বাচিত হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।

(নোট: লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ -এর দিনক্ষণ জানানো হবে।)

বিস্তারিত তথ্যের জন্য অফিসে কাজের দিনগুলিতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন। (সময়: সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা)

Office: 01872-501130,

Mobile: 9682587713, 09682627592

ই-মেলঃ diwan@qadian.in

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মমালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

জুমআর খুতবা

যখন এক-অদ্বিতীয় খোদার মর্যাদার প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে এবং শিরকের জয়ধ্বনি উচ্চকিত করা হয়েছে- তখন তাঁর (সা.) অন্তর ব্যাকুল হয়ে ওঠে আর তিনি (সা.) অত্যন্ত তেজোদীপ্ত কণ্ঠে সাহাবীদের দিকে তাকিয়ে বলেন, তোমরা উত্তর দিচ্ছ না কেন? সাহাবীরা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা কী বলব? তিনি (সা.) বলেন, বলো! আল্লাহু আ'লা ওয়া আজাল, আল্লাহু আ'লা ওয়া আজাল। অর্থাৎ তোমরা মিথ্যা বলছ যে, হুবলের মর্যাদা উন্নীত হয়েছে। এটি তোমাদের মিথ্যা। বরং এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্-ই পরম সম্মানিত এবং তাঁর সম্মানই অতি মহান।

আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেন, হ্যাঁ, আলী আমার আর আমি আলীর। তখন জিবরাঈল বলেন, আমি আপনাদের দুজনের সাথে আছি।

মহানবী (সা.) মাথা উঁচু করে মানুষকে দেখতে গেলে হযরত আবু তালহা বলতেন যে, بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ لَا يُصِيبُكَ سَهْمٌ نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ অর্থাৎ আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত, মাথা উঁচু করে দেখবেন না পাছে তাদের (নিক্ষিপ্ত) তিরগুলোর মধ্য থেকে কোনো তির আপনার দেহে বিদ্ধ হয়। আমার বক্ষ আপনার বক্ষের সামনে আছে।

হযরত তালহা (রা.) বলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كُلُّ مُصِيبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ (আলহামদুলিল্লাহি কুল্লু মুসিবাতিন বা'দাহু জালাল) অর্থাৎ, সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার; মহানবী (সা.)-এর যদি ভালো থাকেন তাহলে সকলদুঃখ-বেদনা তুচ্ছ।

উহুদের যুদ্ধের পর জনৈক ব্যক্তি তালহা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, যখন আপনার হাতে তির এসে বিদ্ধ হতো তখন কি আপনি ব্যথা পেতেন না আর আপনার মুখ থেকে কি উফ্ শব্দ বের হতো না? তালহা (রা.) উত্তরে বলেন, 'ব্যথাও হতো আর উফ্ শব্দও বের হবার উপক্রম হতো, কিন্তু আমি উফ্ করতাম না; পাছে উফ্ করতে গিয়ে আমার হাত সরে যায় আর মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারায় এসে তির বিদ্ধ হয়।'

সা'দ (রা.) বলেন, আমি তির নিক্ষেপ করতেই মহানবী (সা.) সাথে এই দোয়া করতেন, "হে আল্লাহ্! তার তির লক্ষ্যভেদী করে দাও এবং তার দোয়া গ্রহণ করো।" এমনকি যখন আমি তূণ থেকে তির নিক্ষেপ করে শেষ করি তখন মহানবী (সা.) নিজের তূণ থেকে তির বের করে ছড়িয়ে দেন

উহুদের যুদ্ধে হযরত আবু দুজানা (রা.) মহানবী (সা.)-এর সুরক্ষায় তাঁর জন্য ঢাল হিসেবে ছিলেন। অর্থাৎ, তিনি মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে তাঁর দিকে মুখ করে দণ্ডায়মান হন। যে তিরই আসতো তা হযরত আবু দুজানা (রা.)-র কোমরে বিদ্ধ হত। তিনি (সম্মুখে) ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ছিলেন আর সকল তির নিজ পিঠে ধারণ করছিলেন। এক পর্যায়ে তাঁর পিঠে অগণিত তির বিদ্ধ হয়ে যায়।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২ঁফেব্রুয়ারী , ২০২৪, এর জুমুআর খুতবা (২ তবলীগ, ১৪০৩ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, উহুদের যুদ্ধের ঘটনাবলির পেক্ষাপটে আমি সাহাবীদের কুরবানি এবং তাঁদের রসূলপ্রেমের বিভিন্ন উদাহরণ তুলে ধরেছিলাম। সেগুলোর মাঝে হযরত আলীর বীরত্বের ঘটনাবলিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত আলী সম্পর্কে রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, উহুদের যুদ্ধে ইবনে কামিয়া যখন হযরত মুসআব বিন উমায়েরকে শহীদ করে তখন সে মনে করে, সে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-কে শহীদ করে দিয়েছে। অতএব সে কুরাইশের কাছে ফিরে যায় এবং বলে, আমি মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করে ফেলেছি। হযরত মুসআব যখন শহীদ হন তখন আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) পতাকা হযরত আলীর হাতে সোপর্দ করেন। অতএব হযরত আলী এবং অন্য মুসলমানরা লড়াই করেন। (আসসীরাতুন নবুয়্যত, লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৫২৯)

হযরত আলী একের পর এক কাফিরদের পতাকাবাহকদের হত্যা করেন। মহানবী (সা.) কাফিরদের একটি দলকে দেখে হযরত আলীকে তাদের ওপর আক্রমণ করার নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত আলী আমর বিন আব্দুল্লাহ্ জুমহীকে হত্যা করেন এবং তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেন। এরপর তিনি (সা.) কাফিরদের দ্বিতীয় দলের ওপর আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। হযরত আলী , শায়বা বিন মালেককে হত্যা করেন। তখন হযরত জিবরাঈল বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! নিশ্চয় তিনি সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্য। [অর্থাৎ হযরত আলী সম্পর্কে এ কথা বলেন।] তখন আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেন, হ্যাঁ, আলী আমার আর আমি আলীর। তখন জিবরাঈল বলেন, আমি আপনাদের দুজনের সাথে আছি।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৫)

এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে শিয়ারা বাড়াবাড়ি করে থাকে।

হযরত আলী বর্ণনা করেন যে, উহুদের যুদ্ধে যখন মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে লোকেরা দূরে সরে পড়েছিল তখন আমি শহীদদের লাশের মাঝে সন্ধান করে তাদের মাঝে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-কে পাই নি। তখন আমি (মনে মনে) বলি, খোদার কসম, মহানবী (সা.) পলায়নকারী নন আর আমি তাঁকে শহীদদের মাঝেও খুঁজে পাই নি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তিনি তাঁর নবীকে উঠিয়ে নিয়েছেন। অতএব যতক্ষণ আমি নিহত না হই, লড়ে যাওয়ার মাঝেই আমার মঙ্গল নিহিত। হযরত আলী বলেন, এরপর আমি আমার তরবারির খাপ ভেঙে ফেলি আর কাফিরদের ওপর আক্রমণ করি। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে আমি দেখতে পাই, মহানবী (সা.) তাদের মাঝখানে আছেন। (উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৯৩)

সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব রেওয়ায়েত করেছেন যে, উহুদের যুদ্ধে হযরত আলী ১৬টি আঘাত পেয়েছিলেন।

সমস্যাবলীর অন্তরালে কল্যাণভাণ্ডার লুক্কায়িত থাকে- হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, হযরত আলী উহুদের যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে হযরত ফাতেমাকে নিজের তরবারি দেন এবং বলেন, এটিকে ধুয়ে দাও; আজ এই তরবারি অনেক কাজ করেছে। মহানবী (সা.) হযরত আলীর এই কথা শুনছিলেন। তিনি বলেন, আলী! শুধু তোমার তরবারিই কাজ করেনি, তোমার আরও অনেক ভাইয়েরা রয়েছে যাদের তরবারি নৈপুণ্য দেখিয়েছে। তিনি (সা.) ছয়-সাতজন সাহাবীর নাম উচ্চারণ করে বলেন, তাদের তরবারি তোমার তরবারির চেয়ে কম ধারালো ছিল না। " (আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৯, পৃ: ৫৯)

এ প্রেক্ষিতে হযরত আবু তালহা আনসারী সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, হযরত আনাস বর্ণনা করেন, যখন উহুদের যুদ্ধ হয় তখন মানুষ পরাজিত হয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর হযরত আবু তালহা মহানবী (সা.)-এর সামনে তাঁকে নিজ ঢালের আড়ালে নিয়ে

দণ্ডায়মান থাকেন। তিনি এমন তিরন্দাজ ছিলেন যিনি ধনুক জোরে টানতেন। তিনি সেদিন দুটি বা তিনটি ধনুক ভাঙেন। অর্থাৎ এত জোরে টানতেন যে,ধনুক ভেঙে যেত। আর তখন সাহাবীদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই তিরের তূণ সাথে নিয়ে সেদিক দিয়ে যেত মহানবী (সা.) তাকে বলতেন, আবু তালহাকে তির দিয়ে দাও। অর্থাৎ তিনি দক্ষ তিরন্দাজ, তাই নিজের তিরও তাকে দিয়ে দাও। তিনি তখন মহানবী (সা.)-এর সামনে দণ্ডায়মান ছিলেন। হযরত আনাস বলতেন, মহানবী (সা.) মাথা উঁচু করে মানুষকে দেখতে গেলে হযরত আবু তালহা বলতেন যে, بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ يَارَسُوْلَ اللهِ لَا يُصِيْبُكَ سَهْمٌ نَحْرِيْ دُوْنَ نَحْرِكَ (বে আবি আনতা ওয়া উম্মী ইয়া রাসূলাল্লাহ্, লা ইয়ুসিবুকা সাহমুন নাহরী দূনা নাহরিক) অর্থাৎ আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত, মাথা উঁচু করে দেখবেন না পাছে তাদের (নিক্ষিপ্ত) তিরগুলোর মধ্য থেকে কোনো তির আপনার দেহে বিদ্ধ হয়। আমার বক্ষ আপনার বক্ষের সামনে আছে। এ হাদীসটি বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪০৬৪) (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৩৮৫)

হযরত আনাস বিন মালেক বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু তালহা একটি মাত্র ঢাল দিয়েই মহানবী (সা.)-এর সুরক্ষা করছিলেন। হযরত আবু তালহা দক্ষ তিরন্দাজ ছিলেন। তিনি যখন তির চালাতেন তখন মহানবী (সা.) মাথা উঁচু করে তার তির কোথায় গিয়ে পড়েছে তা দেখতেন।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস ২৯০২)

উহুদের যুদ্ধে হযরত আবু তালহার এই পঙক্তি পাঠেরও উল্লেখ পাওয়া যায়,

وَجْهِيْ لِوَجْهِكَ الْوِقَاءُ وَنَفْسِيْ لِنَفْسِكَ الْفِدَاءُ

(ওয়াজহী লেওয়াজহিকাল ভিকাউ ওয়া নাফসী বেনাফসিকাল ফিদাউ)

অর্থাৎ, আমার চেহারা আপনার চেহারাকে রক্ষার জন্য। আর আমার প্রাণ আপনার প্রাণের জন্য উৎসর্গিত।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬৬৫)

হযরত আবু তালহা আনসারী সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন,আবু তালহা আনসারী তির চালাতে চালাতে তিনটি ধনুক ভেঙেছেন আর শত্রুদের তিরের বিপরীতে বুক পেতে দিয়ে মহানবী (সা.)-এর দেহকে নিজ ঢাল দ্বারা আড়াল করেছেন।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৪৯৫)

অতঃপর হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্‌র উল্লেখ রয়েছে। তিনি (অর্থাৎ পূর্বের জন) ছিলেন আনসারী আর ইনি কুরাইশভুক্ত ছিলেন। উহুদের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.)-কে রক্ষা করতে গিয়ে তিনি নিজের হাত দিয়ে তির প্রতিহত করেন। হযরত তালহা উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা সেদিন আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর সাথে অবিচল থাকেন আর তাঁর হাতে মৃত্যুর শর্তে বয়আত করেন। মালেক বিন যুহায়ের মহানবী (সা.)-কে লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করে। তখন হযরত তালহা মহানবী (সা.)-এর চেহারাকে নিজের হাত দ্বারা রক্ষা করেন। তির তার কনিষ্ঠায় আঘাত করে যার ফলে তা অকেজো হয়ে যায়। যখন প্র থম তিরটি তার হাতে লাগে, তখন কষ্টের তীব্রতায় তার মুখ থেকে আহ্ শব্দ বের হয়। মহানবী (সা.) বলেন, তিনি যদি বিসমিল্লাহ্ বলতেন তাহলে এমনভাবে জান্নাতে প্রবেশ করতেন যে, মানুষ তার দিকে তাকিয়ে থাকত।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, , ৩য় খণ্ড,পৃ: ১৬২-১৬৩)

এই ঘটনারই বিস্তারিত বিবরণ সীরাতুল হালাবিয়াতে একটি রেওয়ায়েতে এভাবে রয়েছে যে, কায়েস বিন আবু হাযম বলেন, আমি উহুদের দিন হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্‌র হাতের অবস্থা দেখি যা আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-কে তির থেকে রক্ষা করতে গিয়ে বিকল হয়ে গিয়েছিল। একটি উক্তি অনুসারে, তাতে বর্শা লেগেছিল এবং তা থেকে এত রক্ষপাত হয় যে, তিনি দুর্বলতায় অচেতন হয়ে পড়েন। হযরত আবু বকর (রা.) তার মুখমণ্ডলে পানির ছিটা দেন ফলে তার জ্ঞান ফিরে আসে। চেতনা ফিরে আসামাত্রই তিনি জিজ্ঞেস করেন, মহানবী (সা.) কেমন আছেন? হযরত আবু বকর (রা.) তাকে বলেন, তিনি (সা.) ভালো আছেন আর তিনিই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

হযরত তালহা (রা.) বলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كُلُّ مُصِيْبَةٍ بَعْدَهٗ جَلَلٌ (আলহামদুলিল্লাহি কুল্লু মুসিবাতিন বা'দাহু জালাল) অর্থাৎ, সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার; মহানবী (সা.)-এর যদি ভালো থাকেন তাহলে সকলদুঃখ-বেদনা তুচ্ছ। (সীরাত হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২৪)

আয়েশা ও উম্মে ইসহাক, যারা হযরত তালহা (রা.)-র কন্যা ছিলেন, তারা উভয়ে বর্ণনা করেন, উহুদের দিন আমাদের পিতার দেহে ২৪টি আঘাত লেগেছিল, যার মাঝে একটি চতুষ্কোণ বিশিষ্ট আঘাত মাথায় লেগেছিল এবং পায়ের রগ কেটে গিয়েছিল, আঙু ল অকেজোহয়ে গিয়েছিল আর অন্যান্য আঘাত শরীরের (বিভিন্ন স্থানে) ছিল। তিনি মুর্ছা গিয়েছিলেন। (এদিকে) মহানবী (সা.)-এর সম্মুখের দুটি দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল, তাঁর মুখমণ্ডলও ক্ষতবিক্ষত ছিল। তিনি (সা.)-ও চেতনা হারিয়ে ফেলেছিলেন। হযরত তালহা (রা.) তাঁকে নিজের পিঠে বহন করে এমনভাবে উল্টো পায়ে পেছনে যেতে থাকেন যেন কোনো মুশরিক (তার) সামনেপড়লে তিনি তার সাথে লড়াই করতেন। এভাবে তিনি তাঁকে (সা.) গিরিপথে নিয়ে যান এবং হেলান দিয়ে বসিয়ে দেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, , ৩য় খণ্ড,পৃ:১৬৩)

উহুদের যুদ্ধ এবং নিভীক ও বিশ্বস্ত সাহাবীদের সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এভাবে বর্ণনা করেন যে, উহুদের যুদ্ধের দিন যখন খালিদ বিন ওয়ালীদ মুসলমানদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে আর মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় তখন কয়েকজন সাহাবী ছুটে এসে মহানবী (সা.)-এর চতুর্দিকে জড়ো হয়ে যান, যাদের সংখ্যা খুব বেশি হলে ত্রিশজন ছিল। কাফিররা সর্ব শক্তি দিয়ে সেই স্থানে হামলা করে যেখানে মহানবী (সা.) দণ্ডায়মান ছিলেন। একের পর এক সাহাবী তাঁর সুরক্ষায় নিহত হচ্ছিলেন। অসিচালকরা ছাড়াও তিরন্দাজরা উঁচু টিলায় দাঁড়িয়ে মহানবী (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে অসংখ্য তির নিক্ষেপ করছিল। কুরাইশ বংশোদ্ভূত মুহাজির (সাহাবী) তালহা (রা.) যখন দেখলেন, শত্রুরা সকল তির মহানবী (সা.)-এর মুখমণ্ডল লক্ষ্যকরে নিক্ষেপ করছে তখন তিনি নিজের হাত মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখমণ্ডলের সামনে ধরে রাখেন। লক্ষ্যভেদী উপর্যুপরি তির তালহার হাতে বিদ্ধ হচ্ছিল, কিন্তু এই দুঃসাহসী ও বিশ্বস্ত সাহাবী নিজের হাতকে তিল পরিমাণও নড়তে দেন নি। এমনিভাবে তির বিদ্ধ হতে থাকে আর, তালহা (রা.)-র হাত আঘাতের তীব্রতার কারণে একেবারে অকেজো হয়ে যায় আর তখন কেবল তার একটি হাতই রয়ে যায়।

বহু বছর পর ইসলামের চতুর্থ খিলাফতের যুগে যখন মুসলমানদের মাঝে গৃহযুদ্ধ বাধে তখন কোনো এক শত্রু তির্যক মন্তব্য করে তালহাকে পঙ্গু বলে সম্বোধন করে, অর্থাৎ তোমার হাত অকেজো। তখন আরেকজন সাহাবী বলেন, হ্যা! পঙ্গু তো বটেই, কিন্তু কত বরকতমণ্ডিত এই পঙ্গু! তুমি কি জানো, তালহার এই হাত মহানবী (সা.)-এর সুরক্ষার্থে লুলা হয়েছিল? উহুদের যুদ্ধের পর জনৈক ব্যক্তি তালহা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, যখন আপনার হাতে তির এসে বিদ্ধ হতো তখন কি আপনি ব্যথা পেতেন না আর আপনার মুখ থেকে কি উফ্ শব্দ বের হতো না? তালহা (রা.) উত্তরে বলেন, 'ব্যথাও হতো আর উফ্ শব্দও বের হবার উপক্রম হতো, কিন্তু আমি উফ্ করতাম না; পাছে উফ্ করতে গিয়ে আমার হাত সরে যায় আর মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারায় এসে তির বিদ্ধ হয়।'

(দিবাচার তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ২৫০)

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) সেসব নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীর একজন ছিলেন, যারা পরম সাহসিকতা এবং বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত প্রদর্শ ন করেছেন। আয়েশা বিনতে সা'দ তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন যে, তিনি (রা.) বলেছেন, শত্রুরা যখন পুনরায় আক্রমণ করে তখন আমি একদিকে সরে যাই। আমি বলি, আমি তাদের আমার কাছ থেকে সরিয়ে দেবো। হয় আমি নিজেই মুক্তি লাভ করব কিংবা শহীদ হয়ে যাব। (এরপর) আচমকা আমি রক্তিম চেহারার অধিকারী এক ব্যক্তিকে দেখি। তার বিরুদ্ধে মুশরিকদের জয়ী হবার উপক্রম হতেই সে নিজের হাতে কঙ্কর ভর্তি করে তাদের দিকে ছুঁড়ে মারে, তখন আমার ও সেই ব্যক্তির মাঝে অকস্মাৎ মিকদাদ চলে আসে। তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করতে চাইলে তিনি আমাকে বলেন, হে সা'দ! ইনি মহানবী (সা.)! যিনি তোমাকে ডাকছিলেন। (একথা শুনে) আমি দাঁড়াই এবং আমার এমন মনে হলো, আমি যেন কোনো আঘাতই পাই নি। আমি মহানবী (সা.)-এর সমীপে গেলে তিনি আমাকে তাঁর সামনে বসান। আমি তির নিক্ষেপ করা আরম্ভ করি আর বলি, 'হে আল্লাহ্! এটি তোমার তির, এদ্বারা তোমার শত্রুদের বিনাশ করে দাও'। অপরদিকে মহানবী (সা.) বলছিলেন, "হে আল্লাহ্! তুমি সা'দ-এর দোয়া গ্রহণ করো। হে আল্লাহ্! সা'দ-এর নিশানাকে লক্ষ্যভেদ করে দাও। হে সা'দ! আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য নিবেদিত।" ঘটনার ধারাবাহিকতায় হযরত সা'দ বলেন, আমি এভাবে করছিলাম; কিন্তু সে সময়ের আবহ এমন ছিল যে, আমার মনে হচ্ছিল- আমাদের মাঝে কোনো ফেরেশ্‌তা এসে গেছে (আর) সেও (আমাদের) পাশাপাশি লড়াই করছে। কিন্তু সে সময় কেউ আমাকে বলে, তিনি ছিলেন মহানবী (সা.)। এটি দিব্যদর্শনমূলক দৃশ্যও হতে পারে বা রণক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটে থাকবে। তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছেই ছিলেন। সা'দ (রা.) বলেন, আমি তির নিক্ষেপ করতেই মহানবী (সা.) সাথে এই দোয়া করতেন, "হে আল্লাহ্! তার তির লক্ষ্যভেদী করে দাও এবং তার দোয়া

গ্রহণ করো।" এমনকি যখন আমি তূণ থেকে তির নিক্ষেপ করে শেষ করি তখন মহানবী (সা.) নিজের তূণ থেকে তির বের করে ছড়িয়ে দেন এবং আমাকে ফলা ও পালকহীন একটি তির প্রদান করেন আর সেটি অন্যান্য তিরের চেয়ে বেশি তীক্ষ্ণ বা বেশি গতিশীল ছিল।

আল্লামা যুহরী লিখেছেন, সেদিন সা'দ (রা.) এক হাজার তির নিক্ষেপ করেছিলেন। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২০০)

উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর নিকট যখন অল্প কয়েকজন সাহাবী অবিচল রয়ে গিয়েছিলেন তখন হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-র ভূমিকা সম্পর্কে সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে লিখেছেন: মহানবী (সা.) স্বয়ং হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস (রা.)-র হাতে তির তুলে দেন আর হযরত সা'দ (রা.) উপর্যুপরি শত্রুদের লক্ষ্য করে সেসব তির ছুড়তে থাকেন। একবার মহানবী (সা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে বলেন, "তোমার জন্য আমার পিতা-মাতা নিবেদিত, অনবরত তির নিক্ষেপ করতে থাকো"। সা'দ (রা.) সারা জীবন শব্দগুলো অত্যন্ত গর্বের সাথে বর্ণনা করতেন।'

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৪৯৫)

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণি ত হয়েছে, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) নিজের তূণ থেকে তির বের করে আমার সামনে ছড়িয়ে দেন এবং তিনি (সা.) বলেন, "তির নিক্ষেপ করো, আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য নিবেদিত"।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি হাদীস-৩৭৫৩)

হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, 'আমি মহানবী (সা.)-কে কখনো হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) ব্যতিরেকে অন্য কারও জন্য নিজের পিতা-মাতাকে উৎসর্গ করার দোয়া করতে শুনি নি'। উহুদের যুদ্ধের সময় তিনি (সা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে বলেছিলেন, "আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য নিবেদিত, তির চালিয়ে যাও। হে শক্তিশালী যুবক! তির ছুঁড়তে থাকো"। (জামে তিরমিযি, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৭৫৩)

কিন্তু বুখারীতে অন্য আরেকটি রেওয়ায়েতও রয়েছে যে, ইতিহাসে হযরত সা'দ (রা.) ব্যতিরেকে হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)-র নামও পাওয়া যায়, যাকে মহানবী (সা.) বলেছেন, فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي (ফিদাকা আবি ওয়া উম্মী) অর্থাৎ, "আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য নিবেদিত"।

(সহীহ বুখারী, কিতাবু ফাযাইলিন নবী, হাদীস-৩৭২০)

অনুরূপভাবে হযরত আবু দুজানা (রা.)-র কুরবানীরও উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, উহুদের যুদ্ধে হযরত আবু দুজানা (রা.) মহানবী (সা.)-এর সুরক্ষায় তাঁর জন্য ঢাল হিসেবে ছিলেন। অর্থাৎ, তিনি মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে তাঁর দিকে মুখ করে দণ্ডায়মান হন। যে তিরই আসতো তা হযরত আবু দুজানা (রা.)-র কোমরে বিদ্ধ হত। তিনি (সম্মুখে) ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ছিলেন আর সকল তির নিজ পিঠে ধারণ করছিলেন। এক পর্যায়ে তাঁর পিঠে অগণিত তির বিদ্ধ হয়ে যায়।

(সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১৪)

হযরত আবু দুজানার অবিচলতার বিষয়ে মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে লিখেছেন যে, হযরত আবু দুজানা দীর্ঘক্ষণ পর্য ন্ত নিজের শরীর দ্বারা তাঁর (সা.) শরীর আগলে রাখেন। যে তির আর পাথরই আসতো তা তিনি নিজের ওপর নিতেন। একসময় তাঁর শরীর তির বিদ্ধ হতে হতে ঝাঁঝরা হয়ে যায়। কিন্তু তিনি উফ্ শব্দটুকুও করেন নি। পাছে তার শরীর নড়লে মহানবী (সা.)-এর শরীরের কোনো অংশ অরক্ষিত হয়ে যায় এবং তাঁর (সা.)দেহে কোনো তির বিদ্ধ হয়। "

(সীরাত খাতামান্নবীইন, পৃ: ৪৯৫)

এরপর রয়েছেন হযরত সাহল বিন হুনায়েফ (রা.)। তিনিও মহা মর্যাদাবান সাহাবীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যিনি উহুদের দিন অবিচলতা দেখিয়েছেন। এদিন তিনি মৃত্যুর শর্তে মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়আত করেন। তিনি সেদিন মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে যান। শত্রুর ভয়াবহ আক্রমণের ফলে যখন মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে সেদিন তিনি মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে তির নিক্ষেপ করেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, সাহলের হাতে তির তুলে দাও কেননা সে দক্ষ তিরন্দাজ।

(আল ইসতিয়াব, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৬২-৬৬৩)

এরপর একজন মহিলা সাহাবীরও উল্লেখ পাওয়া যায় যার নাম ছিল হযরত উম্মে আম্মারা (রা.)। তিনি উহুদের যুদ্ধে বীরত্বের নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। আর এই বীরত্বের নৈপুণ্য প্রদর্শনকারী ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও আত্মত্যাগী সাহাবীয়া। তার পুরো নাম ছিল উম্মে আম্মারা মাযানিয়াহ। হযরত উম্মে আম্মারার নাম ছিল 'নুসায়বা' অর্থাৎ তার প্রকৃত নাম ছিল 'নুসায়বা'। তিনি ছিলেন হযরত যায়েদ বিন আসেমের সহধর্মিণী। তিনি বর্ণনা করেন, হযরত উম্মে আম্মারা স্বয়ং বর্ণনা করেন যে, উহুদের যুদ্ধের সময় আমি এটি দেখার জন্য রওয়ানা হই যে, লোকজন কী করছে! আমার কাছে পানি ভর্তি একটি মশকও ছিল যা আমি আহতদের পান করানোর জন্য নিজের সাথে নিয়ে নিয়েছিলাম। একপর্যায়ে আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে উপস্থিত হই। সে-সময় তিনি সাহাবী পরিবেষ্টিত ছিলেন। তখন মুসলমানরা ভালো অবস্থানে ছিল; [অর্থাৎ যুদ্ধের প্রারম্ভিক অবস্থার কথা হচ্ছে।]আকস্মিকভাবে সাহাবায়ে কেরাম ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়; [অর্থাৎ গিরিপথ ছেড়ে দেওয়া এবং পশ্চাৎ দিক থেকে মুশরিকদের হামলা করার যে ঘটনা ঘটেছিল- সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন।] তিনি বলেন, এদিকে মুশরিকরা চতুর্দিক থেকে মহানবী (সা.)-এর ওপর একযোগে হামলা করে। এই অবস্থা দেখে আমি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে থাকি। আমি তরবারি দ্বারা শত্রুকে মহানবী (সা.)-এর কাছে আসতে বাধা দিচ্ছিলাম। পাশাপাশি আমি তিরও নিক্ষেপ করছিলাম। এক পর্যায়ে আমি নিজেও আহত হয়ে যাই। তার কাঁধে গভীর এক আঘাত লাগে। যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমাকে কে আহত করেছে? তিনি বলেন, ইবনে কামিয়া। হযরত উম্মে আম্মারা (রা.) বর্ণনা করেন, মুসলমানরা যখন মহানবী (সা.)-এর পাশ থেকে হঠাৎ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, তখন সে তথা ইবনে কামিয়া একথা বলতে বলতে অগ্রসর হতে থাকে যে, মুহাম্মদকে আমায় চিনিয়ে দাও, কেননা আজ সে রক্ষা পেলে বুঝবে- আমার রক্ষা নেই। অর্থাৎ আজ হয় সে মরবে নয়তো আমি মরব। তিনি বলেন, সে যখন কাছে আসে তখন আমি এবং মুসআব বিন উমায়ের তার পথে বাদ সাধি। তখন সে আমার ওপর হামলা করে আমার কাঁধে আঘাত হানে। (তোমরা আমার কাছে কাঁধের আঘাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ;সে এই আঘাত করেছে)। আমি তার ওপর কয়েকবার আঘাত করি, কিন্তু খোদার এই শত্রু দুটি বর্ম পরিহিত ছিল।কতক আলেম লিখেছেন, উহুদের যুদ্ধে নুসায়বা, তার স্বামী হযরত যায়েদ বিন আসেম এবং তাদের উভয় পুত্র খুবায়েব ও আব্দুল্লাহ্- সকলেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন।মহানবী (সা.) তাদের সবাইকে বলেছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের পরিবারকে আশিসমণ্ডিত করুন। যাহোক মহানবী (সা.) এই দোয়া করলে উম্মে আম্মারা অর্থাৎ 'নুসায়বা' মহানবী (সা.)-এর নিকট নিবেদন করেন, আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করুন যেন জান্নাতে আমরা আপনার সাথে থাকতে পারি। তিনি (সা.) দোয়া করেন, হে আল্লাহ! তাদেরকে জান্নাতে আমার বন্ধু ও সাথি বানাও। সে সময় হযরত উম্মে আম্মারা বলেন, এ জগতে এখন আমার কী হয় তা নিয়ে আর কোনো মাথাব্যথা নেই। এই যে দোয়া আমি লাভ করেছি, এটিই আমার জন্য যথেষ্ট।

মহানবী (সা.) তার সম্পর্কে বলেন, উহুদের যুদ্ধের দিন আমি ডানে-বামে যেদিকেই তাকাতাম তাকে দেখতাম যে, সে আমার সুরক্ষার জন্য শত্রুদের সাথে লড়াই করছে। উহুদের যুদ্ধে হযরত উম্মে আম্মারা (রা.) বারোটি আঘাত পান, যার মধ্যে বর্শার আঘাতও ছিল এবং তরবারির আঘাতও ছিল। (সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১৩-৩১৪)

হযরত উম্মে আম্মারা (রা.) সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে লিখেছেন: 'এক মুসলিম নারী যার নাম ছিল উম্মে আম্মারা, তিনি তরবারি হাতে সারি বিদীর্ণ করে মহানবী (সা.)-এর নিকট পৌঁছেন। সে সময় আব্দুল্লাহ্ বিন কামিয়া মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হচ্ছিল। এই মুসলিম নারী দ্রুতগতিতে অগ্র সর হয়ে সেই আঘাত নিজের কাঁধে নেন এবং নিজের তরবারি উঠিয়ে তার ওপর আক্রমণ করেন, কিন্তু সে দ্বিগুণ বর্ম পরিহিত পুরুষ ছিল এবং তিনি দুর্বল নারী ছিলেন, এজন্য সেই আক্রমণ কার্যকরী হয় নি; ফলে ইবনে কামিয়া হুংকার তুলে সাহাবীদের সারি ভেদ করে সামনে অগ্রসর হয় এবং সাহাবীদের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও মহানবী (সা.)-এর নিকটে পৌঁছে যায় এবং পৌঁছামাত্রই এত প্রবলভাবে এবং নির্মমভাবে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারায় আঘাত করে যে, সাহাবীদের হৃদয় কেঁপে ওঠে। আত্মোৎসর্গকারী সাহাবী হযরত তালহা (রা.) ঝাঁপিয়ে পড়ে খোলা হাতে সেই আঘাত প্রতিহত করেন, কিন্তু ইবনে কামিয়ার তরবারি তার হাত ছিন্ন করে মহানবী (সা.)-এর এক পাশে লাগে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আঘাত গুরুতর ছিল না, কেননা মহানবী (সা.) উপর-নীচে দুটি বর্ম পরিধান করে রেখেছিলেন এবং হামলারতীব্রতাও হযরত তালহা (রা.)-র আত্মত্যাগমূলক পদক্ষেপের কারণে কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল।কিন্তু এই আঘাতে মহানবী (সা.) মাথা ঘুরে নীচে পড়ে যান আর ইবনে কামিয়া পুনরায় আনন্দে এ স্লোগান দেয় যে, আমি মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করেছি। ইবনে কামিয়া তো মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করে আনন্দে স্লোগান দিয়ে পিছু হটে যায় আর আত্মপ্রাসাদ নিতে থাকে যে, আমি মহানবী (সা.)-কে হত্যা করেছি। কিন্তু মহানবী (সা.) পড়ামাত্রই

তৎক্ষণাৎ হযরত আলী (রা.) এবং হযরত তালহা (রা.) মহানবী (সা.)-কে ওপরে উঠিয়ে নিয়ে আসেন। মহানবী (সা.) জীবিত আছেন এবং নিরাপদে আছেন- একথা জানতে পেরে অধিকাংশ সাহাবীর বিমর্ষ চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এরপর ক্রমশ যুদ্ধের ভয়াবহতা হ্রাস পেতে শুরু করে; কেননা মহানবী (সা.) শহীদ হয়ে গেছেন- এই (গুজবের)প্রশান্তিতে কাফিররা কিছুটা শিথিল হয়ে যায়। আর তাদের কতক নিহতদের দেখাশোনা ও কতক মুসলমান শহীদদের লাশ বিকৃত করার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে যুদ্ধের প্রতি অমনযোগী হয়ে পড়ে। আর অপরদিকে অধিকাংশ মুসলমানও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল।"

(সীরাত খাতামান্নবীইন, পৃ: ৪৯৬-৪৯৭)

যুদ্ধে আবু সুফিয়ানের সাথে কথোপকথনের বর্ণনা পাওয়া যায় এবং কীভাবে কুরাইশরা ফেরত আসে (এ বিষয়টিও)। উহুদের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) যখন সাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ে আরোহণ করেন তখন কাফিররাও তাঁর পিছু নেয়। সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু সুফিয়ান তিনবার চিৎকার করে জিজ্ঞেস করে যে, তাদের মাঝে কি মুহাম্মদ (সা.) আছে? মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে জবাব দিতে নিষেধ করেন। এরপর সে তিনবার উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞেস করে যে, তাদের মাঝে কি আবু কোহাফার ছেলে অর্থাৎ আবু বকর আছে? এরপর তিনবার জিজ্ঞেস করে যে, তাদের মাঝে কি ইবনে খাত্তাব অর্থাৎ উমর আছে? এরপর সে তার সাথিদের নিকট ফেরত যায় আর বলতে থাকে, এরা সবাই নিহত। এটি শুনে হযরত উমর (রা.) নিজেকে সংবরণ করতে পারলেন না আর বলে বসলেন, হে আল্লাহ্‌র শত্রু! খোদার কসম, তুমি মিথ্যা বলেছ। যাদের তুমি নাম নিয়েছ তারা সবাই জীবিত। যা কিছুতোমার কাছে অসহনীয়-এর মাঝে বহু কিছু তোমার এখনো দেখা বাকি আছে। এটিও বুখারীর রেওয়ায়েত।(সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ)

আবু সুফিয়ান বলল, এই যুদ্ধ বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ। যুদ্ধ বালতির বা দোলকের মতো হয়ে থাকে। কখনো একপক্ষের বিজয় হয় আর কখনো অপরপক্ষের বিজয়। তোমাদের লোকদের মাঝে এমন কিছু লাশ পাবে যাদের নাক-কান কেটে ফেলা হয়েছে, অর্থাৎ 'মুসলা' করা হয়েছে। সে বলল, আমি এর আদেশ দিই নি, কিন্তু আমি একে মন্দও মনে করি না। এরপর সে রণসঙ্গীত হিসেবে এই বাক্য পড়তে লাগল, 'উলু হুবল' 'উলু হুবল'- হুবল দেবতার জয় হোক, হুবল দেবতার জয় হোক। মহানবী (সা.) বললেন, এখনো কি তোমরা উত্তর দিবে না? সাহাবা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কী বলব? তিনি (সা.) বললেন, তোমরা বলো, 'আল্লাহু আ'লা ওয়া আজাল্ল!' আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়ো ও সবচেয়ে মর্যাদাবান। এরপর আবু সুফিয়ান বলল, আমাদের উযযা নামের দেবতা আছে, তোমাদের উযযার মতো কোনো দেবতা নেই। মহানবী (সা.) এটি শুনে বললেন, তোমরা কি এখনো তার উত্তর দিবে না? হযরত বারা বিন আযেব (রা.) বর্ণনা করেন, সাহাবা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কী বলব? তিনি (সা.) বললেন, তোমরা বলো, 'আল্লাহু মওলানা ওয়ালা মওলা লাকুম'। আল্লাহ্ আমাদের সাহায্যকারী আর তোমাদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস-৩০৩৯)

এরপর আবু সুফিয়ান চিৎকার করে মুসলমানদের বলল, আগামী বছর বদরের ময়দানে তোমাদের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হবে। এতে মহানবী (সা.) নিজের এক সাহাবীকে বললেন, বলে দাও ঠিক আছে, আমাদের ও তোমাদের সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি রইল।

(সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৩৩)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) 'সীরাত খাতামান্ নবীঈন' পুস্তকে লিখেন, এদিকে মুসলমানরা নিজেদের সেবা শুশ্রূষায় ব্যস্ত ছিল আর অপরদিকে অর্থাৎ নীচে যুদ্ধের মাঠে মক্কার কুরাইশরা মুসলমান শহীদদের লাশগুলোর নির্মমভাবে অমর্যাদা করছিল। 'মুসলা'র হিংস্র প্রথা চরম হিংস্রতার সাথে পালন করা হচ্ছিল এবং মুসলমান শহীদদের লাশগুলোর সাথে মক্কার রক্তপিপাসু পশুরা তাদের যা খুশি তা করেছে। কুরাইশদের নারীরা মুসলমানদের নাক, কান কেটে গলার মালা বানিয়েছে। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা হযরত হামযা (রা.)-র কলিজা বের করে চিবিয়েছে। মোটকথা স্যার উইলিয়াম মিউর-এর ভাষ্যমতে,মুসলমানদের লাশের সাথে কুরাইশরা ভয়ানক হিংস্র আচরণ করেছে। মক্কার নেতারা দীর্ঘক্ষণ রণক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর লাশ খুঁজতে থাকে আর এই দৃশ্য অবলোকন করার তাদের আগ্রহ অপূর্ণই রয়ে যায়। যা পাওয়ার ছিল না তা পেল না। এটা তো হওয়া সম্ভব ছিল না, কেননা তিনি সেখানে ছিলেন না। এই খোঁজে হতাশ হয়ে আবু সুফিয়ান নিজের গুটিকয়েক সাথিকে নিয়ে সেই গিরিপথের দিকে অগ্রসর হয় যেদিকে মুসলমানরা একত্রিত হয়েছিল। আর এর নিকটে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, মুসলমানরা! তোমাদের মাঝে কি মুহাম্মদ আছে (সা.)? মহানবী (সা.) নির্দেশ দিলেন, কেউ যেন উত্তর না দেয়। সে অনুযায়ী সব সাহাবী নীরব রইলেন। এরপর সে আবু বকর ও উমরের ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করল। কিন্তু তাঁর (সা.) নির্দেশ অনুযায়ী কেউ উত্তর দিল না। এতে সে গর্বের সাথে উচ্চৈঃস্বরে বলল, এরা সবাই নিহত হয়েছে, কেননা তারা যদি জীবিত থাকত তাহলে উত্তর দিত। তখন হযরত উমর (রা.) আর নীরব থাকতে পারলেন না আর অবলীলায় বললেন, হে আল্লাহর শত্রু! তুমি মিথ্যাবাদী। আমরা সবাই জীবিত আছি আর খোদা আমাদের হাতে তোমাদের লাঞ্ছিত করবেন। আবু সুফিয়ান হযরত উমরের (রা.) গলার স্বর চিনতে পেরে বললেন, উমর! সত্য করে বলো,মু হাম্মদ কি জীবিত আছে? হযরত উমর (রা.) বললেন, নিঃসন্দেহে! খোদার অনুগ্রহে তিনি জীবিত আছেন এবং তোমার কথাগুলো শুনছেন। আবু সুফিয়ান কিছুটা ক্ষীণস্বরে বলল, তাহলে ইবনে কামিয়া মিথ্যা বলেছে, কেননা আমি তোমাকে তার চেয়ে বেশি সত্যবাদী মনে করি। এরপর আবু সুফিয়ান উচ্চস্বরে বলল, 'উলু হুবল' অর্থাৎ হুবল দেবতার জয় হোক। রসূল করীম (সা.)-এর নির্দেশের কথা ভেবে সাহাবীগণ নিশ্চুপ ছিলেন, যেহেতু তিনি (সা.) প্রথমে তাদেরকে উত্তর দিতে বাধা দিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) নিজের নাম উচ্চারণ হওয়া পর্যন্ত সাহাবীদের চুপ থাকতে বলেন, কিন্তু যখন খোদা তা'লার বিপরীতে প্রতীমার জয়ধ্বনি দেওয়া শুরু হয় তখন তিনি (সা.) আর নিজেকে সংবরণ করতে পারলেন না আর সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা কেন উত্তর দিচ্ছ না? সাহাবা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা কী উত্তর দিব? তিনি (সা.) বললেন, তোমরা বলো, 'আল্লাহু আ'লা ও আজাল্ল' অর্থাৎ মহত্ব ও সম্মান একমাত্র আল্লাহ্ তা'লারই জন্য। (এ কথা শুনে) আবু সুফিয়ান বলল, 'লানা উযযা ওয়ালা উযযা লাকুম'। আমাদের তো একজন উয্যা (দেবতা) আছে আর তোমাদের তো কোনো উয্ যা নেই। মহানবী (সা.) সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা বলো,'আল্লাহু মওলানা ওয়ালা মওলা লাকুম'- 'উয্যা আর কী জিনিস! আমাদের সাথে তো আমাদের সাহায্যকারী আল্লাহ্ তা'লা আছেন, আর তোমাদের কোনো সাহায্যকারী নাই।' এরপর আবু সুফিয়ান বলল, 'যুদ্ধ তো কুয়ার বালতির ন্যায় যা কখনো ওপরে উঠে আসে আবার কখনো নীচে নেমে যায়। সুতরাং তোমরা এই দিনটিকে বদরের প্রতিশোধ মনে করতে পার। আর তোমরা যুদ্ধের ময়দানে তোমাদের লাশগুলোকে বিকৃত ও অঙ্গচ্ছেদকৃত অবস্থায় দেখতে পাবে। আমি এমনটি করার নির্দে শ দেই নি, কিন্তু আমি যখন এ সম্বন্ধে জানতে পারলাম তখন আমার কাছে আমার সৈন্যদের এমন কাণ্ড খারাপও লাগে নি। তোমাদের সাথে আগামী বছর এই দিনগুলোতে বদরের প্রান্তরে আবার যুদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি রইল। রসূল করীম (সা.)-এর নির্দেশে একজন সাহাবী (আবু সুফিয়ানের কথার) উত্তরে বললেন, 'ঠিক আছে, তাহলে এমনটিই কথা থাকল'। একথা বলে আবু সুফিয়ান নিজ সঙ্গীদের নিয়ে (পাহাড় থেকে) নীচে নেমে গেল এবং কুরাইশ সেনাবাহিনী দ্রুত মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যায়।"

তিনি লিখেন, "একটি অদ্ভুত বিষয় হলো কুরাইশরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে বাহ্যত বিজয় লাভ করেছিল এবং সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় তারা যদি চাইতো তাহলে তারা তাদের এই বিজয় থেকে লাভবান হতে পারতো। মদীনার উপর আক্রমনের পথ তো তাদের জন্য খোলাই ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ঐশী হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি এমন হয়ে গেল যে কুরাইশরা বাহ্যত বিজয় লাভ করা সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল, আর উহুদের প্রান্তরে তাদের এই বিজয়কেই নিজেদের জন্য যথেষ্ট জ্ঞান করে দ্রুত মক্কায় ফিরে যাওয়াকে সমীচীন মনে করলো। অপরদিকে রসূল করীম (সা.)-ও অতিরিক্ত সাবধানতামূলকভাবে দ্রুত সত্তরজন সাহাবীর সমন্বয়ে একটি দল প্রস্তুত করে কু রাইশ সৈন্যবাহিনীর পিছনে প্রেরণ করেন; যাদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত যুবায়ের (রা.)ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এটি বুখারীর বর্ণনা। সাধারণ ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন, তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.) কে আবার অন্য কিছু বর্ণনা অনুযায়ী হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসকে (রা.) কুরাইশদের পিছু ধাওয়া করার জন্য প্রেরণ করেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'তোমরা এসংবাদ আনার চেষ্টা কর যে কুরাইশ বাহিনী আবার মদীনার উপর আক্রমণ করার দুরভিসন্ধি রাখে কিনা? তিনি (সা.) তাদেরকে বলেন, তোমরা যদি দেখ কুরাইশরা তাদের উটে আরোহিত অবস্থায় আছে এবং ঘোড়াগুলোকে আরোহীশূন্য হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাহলে তোমরা ধরে নিবে যে তারা মক্কায় ফিরে যাচ্ছে এবং মদীনার উপর আক্রমন করার অভিপ্রায় তাদের নেই। কিন্তু তারা যদি ঘোড়ায় আরোহিত অবস্থায় থাকে তাহলে বুঝে নিবে যে তাদের উদ্দেশ্য ভালো নয়। তিনি (সা.) তাদেরকে

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-9 Thursday, 7 March, 2024 Issue No.10

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

তাগিদ সহকারে বললেন, কুরাইশদের সৈন্যবাহিনী যদি মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয় তাহলে দ্রুত যেন তাঁকে (সা.) সংবাদ দেয়া হয়। তিনি (সা.) উত্তেজিত অবস্থায়বললেন, 'এবার যদি কুরাইশরা মদীনার উপর আক্রমণ করে তাহলে আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তাদেরকে প্রতিহত করে তাদেরকে এই হামলার মজা টের পাইয়ে দেবো'। মহানবী (সা.)-এর প্রেরিত দল তাঁর (সা.) নির্দে শ অনুযায়ী তাদের পিছনে রওয়ানা হলো এবং অতিদ্রুত এই সংবাদ নিয়ে ফিরে আসল যে, কুরাইশ বাহিনী মক্কার দিকেই ফিরে যাচ্ছে।হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) রসূল করীম (সা.)-এর আহত হয়ে অজ্ঞান হওয়া এবং তার পরবর্তী ঘটনাসমূহের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'কিছুক্ষণ পরেই রসূল করীম (সা.)-এর জ্ঞান ফিরে আসল আর সাহাবীরা যুদ্ধক্ষেত্রের চতুর্দিকে এই ঘোষণা করার জন্য লোক পাঠালেন, মুসলমানরা যেন পুনরায় একত্রিত হয়ে যায়। বিক্ষিপ্ত সৈন্যদল পুনরায় একত্রিত হতে শুরু করল আর মহানবী (সা.) তাদেরকে নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে একত্রিত হলেন।পাহাড়ের কোলে অবশিষ্ট সৈন্যরা যখন দাঁড়িয়ে ছিল তখন আবু সুফিয়ান চিৎকার করে বলল, আমরা মুহাম্মদকে (সা.) হত্যা করেছি। মহানবী (সা.) আবু সুফিয়ানের একথার উত্তর দেন নি, পাছে শত্রুরা প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানতে পেরে আক্রমণ করে বসে এবং ক্ষতবিক্ষত মুসলমানরা পুনরায় শত্রুদের আক্রমণের শিকার হয়ে যায় । ইসলামী সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে যখন একথার কোনো উত্তর পেল না তখন আবু সুফিয়ান নিশ্চিত হয়ে গেল, এ ধারণা সঠিক এবং সে গগনবিদারী কণ্ঠে বলে ওঠে, আমরা আবু বকরকেও মেরে ফেলেছি। মহানবী (সা.) আবু বকরকেও নির্দেশ দিলেন, কোনো উত্তর দিও না। এরপর আবু সুফিয়ান বলল, আমরা উমরকেও মেরে ফেলেছি। তখন উমর যিনি কি-না উত্তেজিত স্বভাবের মানুষ ছিলেন, তিনি একথার উত্তরে বলতে চাইলেন যে, আমরা সবাই খোদার কৃপায় জীবিত আছি এবং তোমাদের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু মহানবী (সা.) এ বলে নিষেধ করেন যে, মুসলমানদের কষ্টে ফেলো না আর চুপ থাকো। এমতাবস্থায় কাফিরদের বিশ্বাস হয়ে গেল যে, ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা এবং তঁ ার ডান-বামের লোকদের অর্থাৎ সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য লোকদের হত্যা করেছি। এ কারণে আবু সুফিয়ান এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা আনন্দের আতিশয্যে ধ্বনি উচ্চকিত করে বলে, ইয়া উলুহুবল! উলু হুবল! অর্থাৎ আমাদের সম্মানিত প্রতিমা হুবলের মর্যাদা উন্নীত হোক, কেননা সে আজ ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।" (সীরাত খাতামান্নবীইন, পৃ: ৪৯৮-৫০০)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, সেই রসূল(সা.) যিনি তাঁর নিজের, আবু বকরের এবং উমরের মৃত্যুর ঘোষণার পর চুপ থাকার নির্দেশ প্রদান করেন যেন আহত মুসলমানদের ওপর পুনরায় শত্রুরা ফিরে এসে আক্রমণ না করে এবং মুষ্টিমেয় মুসলমান তাদের হাতে শহীদ না হয়ে যায়, এখন যখন এক-অদ্বিতীয় খোদার মর্যাদার প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে এবং শিরকের জয়ধ্বনি উচ্চকিত করা হয়েছে- তখন তাঁর (সা.) অন্তর ব্যাকুল হয়ে ওঠে আর তিনি (সা.) অত্যন্ত তেজোদীপ্ত কণ্ঠে সাহাবীদের দিকে তাকিয়ে বলেন, তোমরা উত্তর দিচ্ছ না কেন? সাহাবীরা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা কী বলব? তিনি (সা.) বলেন, বলো! আল্লাহু আ'লা ওয়া আজাল, আল্লাহু আ'লা ওয়া আজাল। অর্থাৎ তোমরা মিথ্যা বলছ যে, হুবলের মর্যাদা উন্নীত হয়েছে। এটি তোমাদের মিথ্যা। বরং এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্-ই পরম সম্মানিত এবং তাঁর সম্মানই অতি মহান।

এভাবে তিনি (সা.) তাঁর জীবিত থাকার সংবাদও শত্রুদের কাছে পৌঁছে দেন। এই বীরত্বপূর্ণ ও তেজোদীপ্ত উত্তরে কাফির সৈন্যদের ওপর এত গভীর প্রভাব পড়ে যে, তাদের আশাভরসা সব মাটিতে মিশে গেল এবং তাদের সামনে হাতেগোণা কতক আহত মুসলমান দাঁড়িয়ে ছিল যাদের ওপর আক্রমণ করে তাদেরকে মেরে ফেলা জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে একেবারেই সম্ভব ছিল, কিন্তু তারপরও তারা পুনরায় আক্রমণ করার সাহসই দেখাতে পারে নি। আর যতটুকু বিজয় তারা অর্জন করেছিল সেটির আনন্দে মেতে মক্কায় ফেরত চলে যায়।" (আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ; ২৫২-২৫৩)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বিভিন্ন আঙ্গিকে এই ঘটনাটি নানান জায়গায় বর্ণনা করেছেন যা আগামীতেও বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ্ ।

এখন আমি যেমনটি সবসময় দোয়ার জন্য বলে থাকি- আবার বলছি, ফিলিস্তিনীদের সার্বিক অবস্থার জন্য দোয়া অব্যাহত রাখুন।

শুনেছি, সম্ভবত গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রচেষ্টা চলছে আর ইসরাঈলী সরকারও হয়ত তা কিছুটা মেনে নেবে। কিন্তু লেবানন সীমান্তে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর প্রভাব পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনীদের ওপর পড়তে পারে। পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর মাঝে ন্যায়ের লেশমাত্রও নেই। বর্তমানে তাদের লেখকরাই আরো প্রকাশ্যে লিখছে যে, অন্যায় চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। আমেরিকার নেতারা কেবল তাদের অর্থনীতি চাঙ্গা করার জন্য যুদ্ধ করাচ্ছে এবং এর ফলে তাদের আয়ও বাড়ছে, কেননা তাদের অস্ত্রের কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন তো তাদের নিজেদের বিশ্লেষকরাও এটি বলছে, আমেরিকা নিজেদের অর্থনীতি চাঙ্গা করার মানসে যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করছে এবং পৃথিবীতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। তারা জানে না, এরা খোদা তা'লার শাস্তি এড়াতে পারবে না।

আহমদীদের নিজেদের দোয়া এবং যোগাযোগের মাধ্যমে ধ্বংস থেকে বাঁচার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

সম্প্রতি একটি সংবাদ পাওয়া গেছে, জাতিসংঘের সাহায্যকারী সংস্থাকে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ অন্যান্য দেশ তাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে এ অজুহাতে যে, তাদের এগারো-বারোজন মানুষ হামাসের সাথে সম্পৃক্ত বলে অভিযোগ রয়েছে- এ কারণে ফিলিস্তিনীদেরকে তারা সাহায্য করবে না। এ হলো নিষ্ঠুর আচরণ। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে আরও চাপের মধ্যে ফেলা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, পশ্চিমা বিশ্ব যদি সাহায্য বন্ধ করে থাকে তাহলে তেল সম্পদে সমৃদ্ধ মুসলমান দেশগুলো কেন ঘোষণা করল না যে, আমরা সাহায্য করব। কেননা জাতিসংঘের সেই সংস্থাটি ঘোষণা দিয়েছে যে, সাহায্য যদি না আসে তাহলে ফেব্রুয়ারির পরে আমরা সেখানে কোনো ত্রাণ পাঠাতে পারব না।

যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা মুসলিম দেশগুলোকেও নিজেদের দায়িত্ব পালনের তৌফিক দান করুন আর পৃথিবী থেকে নৈরাজ্য দূর করুন। এখন ইরানের সাথেও যুদ্ধের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইয়েমেনের আহমদীদের জন্যও দোয়া করবেন। আমাদের একজন নিষ্ঠাবান আহমদী সেখানে কারাগারে বা নজরবন্দি থাকা অবস্থায় সঠিক চিকিৎসা না পাবার কারণে মৃত্যু বরণ করেছেন। বিস্তারিত সংবাদ পাওয়া দু ষ্কর। যাহোক, যারা কষ্টে দিনাতিপাত করছেন তাদের জন্য দোয়া করুন। বিস্তারিত তথ্য পাবার পর মরহুমের জানাযাও পড়াব, ইনশাআল্লাহ্।

পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। সবসময় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আহমদীদেরকে টার্গে ট করা হয় আর একইভাবে কতক উগ্রপন্থি সংগঠনের পক্ষ থেকেও জামা'ত শঙ্কার সম্মুখীন। জামা'ত ও জামা'তের সদস্যরা সব স্থানেই দ্বিমুখি হুমকির সম্মুখীন। প্রথমত নাগরিক হিসেবে আর (দ্বিতীয়ত) একজন আহমদী হবার কারণেও। রাবওয়া এবং অন্যান্য শহরের আহমদীদের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদেরকে নিজ সুরক্ষায় রাখেন, তাদের দুষ্কর্মের ফল যেন তাদের ওপরই বর্তায় আর প্রত্যেক দেশের আহমদীদের যেন আল্লাহ্ সুরক্ষা করেন। পৃথিবীবাসী যেন এই সত্যকে অনুধাবন করতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিনত হওয়া ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় নেই। আল্লাহ্ তা'লাকে চেনা আর আল্লাহ্‌র প্রেরিত ব্যক্তিকে গ্রহণ করার মাঝেই তাদের অস্তিত্বের নিশ্চয়তা নিহিত।আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir